জীবন কথন

উম্মে আব্দুল্লাহ

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুশ শাম্‌স

ভূমিকা

উম্মে আবদুল্লাহ। স্বশিক্ষিত এক মহীয়সী নারী। যে সময়টাতে নারীরা শিক্ষা-দীক্ষায় একদম পিছিয়ে সে সময়টাতে তিনি নিজ উদ্যোগে কোরআন, তরজমা, তাফসীর ও নাহু-সরফ আত্মস্থ করেন। *বয়ানুল কোরআনের* মতো সুবিশাল তরজমা ও তাফসীরগ্রন্থ তার মুখস্থ। অসাধারণ প্রতিভাধর এ মানুষটি শৈশবেই কোরআন হেফযের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং নিজের মধ্যে ধারণ করেন মহাগ্রন্থ আলকোরআন। তাঁর আরেকটি পরিচয় না দিলেই নয়—তিনি সাম্প্রতিক সময়ে দীনি জ্ঞানচর্চায় অসামান্য অবদান রাখা মুফতী আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ এবং মুফতী মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহেবদের আম্মা।

বৈচিত্রময় বিপুল জ্ঞানের অধিকারী এ মানুষটিকে আত্মীয়তার সূত্রে দেখছি এক বছরেরও অধিক সময় ধরে। ইলমের পাশাপাশি আমলে নিমগ্ন এ মানুষটির জীবনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম পরিচয়ের পর থেকেই। তিনি নিভৃত পল্লীতে দীনি জ্ঞান বিতরণের পাশাপাশি লেখালেখিও করেন। বেশ কিছু অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি রয়েছে তাঁর। এর মধ্যে মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে প্রকাশিত হয়েছে হজ নির্দেশনামূলক বই ছন্দে রচিত *হজ যাত্রীর সঙ্গী*। দারুল কলম থেকে প্রকাশিত হয়েছে *হাদীসের আলো জীবনের পাথেয়*। এ বইয়ের শুরুতে হযরত মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ সাহেব লিখিত এ মহীয়সী নারীর আংশিক জীবনী পড়েছিলাম। একদিন তাকে অনুরোধ করেছিলাম আত্মজীবনী লিখতে। বলেছিলাম, আপনার জীবনের কিছু আলো আমাদের জন্য রেখে যান। তিনি আমার অনুরোধে সাড়া দিয়েছিলেন। কিছুদিন পরই আমার হাতে তুলে দেন আত্মজীবনীর প্রথম খাতা। *নেয়ামতের* পাঠকদের জন্য এ রত্নগর্ভা মহীয়সী মায়ের আত্মজীবনী *জীবনকথন* পেশ করা হলো। বয়সের ভারে প্রায় ন্যুব্জ এ মানুষটিকে আল্লাহ সুস্থ সবল রাখুন, হায়াতে তায়্যিবা নসীব করুন।

-সহকারী সম্পাদক

আমার মাতৃকুল ও পিতৃকুল একটা পর্যায়ে গিয়ে একধারায় মিলিত হয়। তাই আমার মাতৃকুলের পরিচয় দিয়েই লেখা শুরু করছি। হে আল্লাহ সহজ, সঠিক ও সুন্দরভাবে লেখার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কুমিল্লা জেলার তৎকালীন লাকসাম থানাধীন (বর্তমান মনোহরগঞ্জ) লৎসর গ্রামে আকবর আলী মুন্সি নামে এক ভদ্রলোক বাস করতেন। তাঁর ছিল চার কন্যা। কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। তিন কন্যাকে বিভিন্ন স্থানে বিয়ে দিলেন। ছোট কন্যা আমাতুল্লাহকে সুপাত্রস্থ করে নিজের কাছে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এর মধ্যে খবর পেলেন, নাথের পেটুয়ার কাছে ঠনারপাড় গ্রামে দুই ভাই কোলকাতা থেকে মেডেল পেয়ে পাস করেছেন। সংবাদ পেয়ে আকবর আলী মুন্সি তাঁদের খোঁজে বের হলেন। নাথের পেটুয়া এসে খবর পেলেন, এখানে মাহফিলের আয়োজন আছে। মাহফিলটি ছিল মাওলানা ইমদাদুল্লাহ সাহেবের। ওয়াজ শেষে হুজুরের কাছে দুআ চাইলেন। বললেন, আমার একটা মেয়ে আছে। মাশাআল্লাহ আলেমা সালেহা হাসীনা জামীলা আবেদা যাহেদা। আপনি দুআ করুন, আল্লাহ পাক যেন মেয়েটির জন্য উপযুক্ত পাত্র মিলিয়ে দেন। আমার কোনো ছেলে নেই। মেয়েটি আমার বাড়িতেই থাকবে। দুআ চাই আল্লাহ যেন সহজ করে দেন।

আকবার আলী মুন্সি জানতেন না, এই মাওলানা সাহেবই কোলকাতা ফেরত সে দুই ছেলের বাবা। ঘটনাক্রমে ছেলে দু'জনও মাহফিলে উপস্থিত ছিল। আকবার আলী মুন্সির কথা শুনে মাওলানা ইমদাদুল্লাহ সাহেব বললেন, আমার দুই ছেলে আমীনুদ্দীন ও শরীফুদ্দীন আপনার মেয়ের উপযুক্ত। আপনি যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারেন।

আকবার আলী মুন্সি বললেন, আপনি যাকে ইচ্ছা নির্বাচন করুন। আমার কোনো আপত্তি নেই।

মাওলানা ইমদাদুল্লাহ সাহেব বললেন, আমীনুদ্দীনকেই আপনাকে দিলাম।

মাহফিলেই ছেলের বিয়ে পড়িয়ে দিলেন। সবার কাছ থেকে দুআ নিয়ে ছেলেকে আকবর আলী মুন্সির হাতে তুলে দিলেন। সেদিন তিনি খুব দুআ করেছিলেন, হে খোদা দয়াময়! আজীবন তাদেরকে দীনের সেবার জন্য কবুল করো।

মাওলানা আমীনুদ্দীন সাহেব আকবর আলী মুন্সির বাড়িতে বসবাস করতে থাকেন। তিনি দূরে এক মাদরাসায় পড়াতেন। মাদরাসার নাম মনে নেই। এ সবই দাদুজানের মুখ থেকে শোনা।

মাওলানা আমীনুদ্দীন সাহেবের পাঁচ ছেলে দুই মেয়ে ছিল। ছোট দুই ছেলের একজনের যখন তিন বছর আরেক জনের দুই বছর তখন তিনি হজে যেতে মনস্থ করলেন। মাওলানা আমীনুদ্দীন সাহেবের ছাত্ররা তাঁকে দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ওয়াজ-মাহফিল করাত। একদিন তিনি নোয়াখালী মাহফিলে গেলেন। অনেক দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ ওয়াজ শুনতে এল। হুজুর হজের সফরে যাবেন। তাই আমার দাদাও দুআর জন্য উপস্থিত হলেন। বড় আব্বা দাদাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। বড় আব্বা হুজুরকে বললেন, আমার বিয়ের উপযুক্ত এই একটি ছেলে আরেকটি মেয়ে আছে। আল্লাহ পাক তাঁদের উত্তম চরিত্র দান করেছেন। আপনার কাছে দুআ চাই, আল্লাহ পাক যেন তাঁদের উত্তম বিয়ের ব্যবস্থা করেন!

হুজুর বললেন, আমারও তো এমন উপযুক্ত এক ছেলে ও এক মেয়ে আছে। তাঁদের আমি পরম করুণাময়ের হাতে সোপর্দ করে তাঁর ঘরের দিকে রওয়ানা করছি। আপনি রাজি থাকলে আমার ছেলে-মেয়ের বিয়ে আপনার ছেলে-মেয়ের সঙ্গে এ মাহফিলেই পড়িয়ে দেব।

এ কথা শুনে বড় আব্বা কেঁদে ফেললেন। বললেন, এ তো আপনার অনুগ্রহ। আমি না-লায়েক তো এর উপযুক্ত নই।

হুজুর বললেন,

داد اورا قابلیت شرط نیست

بلکہ شرط قابلیت داد اوست

তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্য যোগ্যতা শর্ত নয়

যোগ্যতার জন্য শর্ত হলো তাঁর অনুগ্রহ লাভ।

বড় আব্বার সম্মতিতে বিপুলসংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে মাওলানা আমীনুদ্দীন সাহেব দুই শুভ বিবাহ সম্পন্ন করেন। মোনাজাত শেষে বিদায় নেন। বউও দেখতে গেলেন না। মেয়ের শ্বশুরবাড়িও দেখতে গেলেন না। পরম করুণাময় খোদার হাতে সবাইকে সঁপে দিয়ে গেলেন। হজে গিয়ে তিনি আর ফিরে আসেননি। তাঁর সঙ্গে তাঁর অনেক ছাত্র হজ্জে গিয়েছিল। সবাই ফিরে আসলেও তিনি ফিরে আসেননি। ছাত্ররা দেশে ফিরে বলেছিল, হজ্জ শেষে তিনি মদীনা মুনাওয়ারা রওয়ানা হলেন। উটের পিঠে নামায পড়ছিলেন। একবার সেজদা বেশি দীর্ঘ দেখে ছাত্ররা ডাকতে গেল কিন্তু কোনো সাড়া শব্দ নেই। ততক্ষণে তিনি ইহজগৎ ছেড়ে চলে গেছেন।

আমার নানা ছিলেন ভাইদের মধ্যে চতুর্থ। তিনি বাবার কাপড় বুকে জড়িয়ে শুধু কাঁদতেন। তাই বড় আব্বার ছাত্ররা তাঁকে অল্প বয়সে মক্কা মুকাররামায় নিয়ে যায়। অনেক বছর সেখানে থেকে লেখা-পড়া করেন। তিনি সেখানে শায়খ আব্দুল হক মুহাজিরে মক্কীর খেদমতে থেকে ইলমে দীনের শিক্ষালাভ করেন। পড়া-শোনা শেষে তিনি দেশে ফিরে আসেন। তিনি পীর ছিলেন। তবে কার কাছ থেকে খেলাফত লাভ করেছিলেন তা জানার সুযোগ হয়নি। তিনি যে পীর ছিলেন তা দাদুজানের মুখে শুনেছি। এরপর নানাজান নোয়াখালীর মাওলানা ইমাদুদ্দীন সাহেবের স্ত্রীর বোনের একমাত্র মেয়েকে বিবাহ করেন।

আমার নানাজানের দাদার নাম মাওলানা ইমদাদুল্লাহ। তাঁর বাবার নাম মাওলানা আমীনুদ্দীন। আমার নানা জানের নাম মাওলানা আব্দুস সালাম। আমার মায়ের নাম আমাতুল্লাহ।

আমার বাবারা ছিলেন সাত ভাই চার বোন। বড় ভাই এবং বোনেরা সবাই শৈশবে মারা যায়। দশ ভাই-বোনের মধ্যে আব্বা ছিলেন সবার

ছোট। আব্বাকে ছোট রেখেই দাদা ইন্তেকাল করেন। তিনি মামাবাড়ি থেকে বড় হন। পনেরো বছর বয়সে মাদরাসায় ভর্তি হন। অনেক ত্যাগ স্বীকার করে লেখা-পড়া করেন।

একসময় দাদু আমার মায়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। আমার মা ছিলেন দেখতে-শুনতে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে অনন্য। তার জন্য দূর-দূরান্তের অনেক ভালো ভালো প্রস্তাব ছিল। সেসব প্রস্তাবের সামনে বাবা ততটা উজ্জ্বল ছিলেন না। তাই আম্মার নানা এ প্রস্তাবে প্রথম দিকে সম্মত ছিলেন না। এ অসম্মতি দেখে দাদা বললেন, আমার ছেলের কাছে বিয়ে না দিলে এ বাড়ি থেকে আমি চিরবিদায় নিলাম।

নানা বললেন, ঠিক আছে আপু আপনি ছেলে নিয়ে আসেন। পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের ওপর ভরসা করে আপনার ছেলের কাছেই মেয়ে বিয়ে দেব। দাদুজান বাবাকে নিয়ে আসলেন। সাদাসিধে বিবাহ হয়ে গেল। বড় আলেমের সঙ্গে বিয়ে হয়নি বলে মায়ের আজীবনই একটা আফসোস ছিল। কারণ, আমাদের বংশে বড় আলেম-উলামা ছিল না।

বাবা মায়ের প্রতি বেশ আন্তরিক ছিলেন। মায়ের ইন্তেকালের পর বাবা বলেছিলেন, ও আমার ঘরে অনাহারে অর্ধাহারে জীবনযাপন করেছে, কোনো দিন একটুও অধৈর্য হয়নি। কারও কাছে অভিযোগও করেনি। কষ্ট করেছে, সন্তুষ্ট মনে এখানে বসবাস করেছে। নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে আমার সুখের জন্য। অনেক ছেলে-মেয়ে নিয়ে অভাব-অনটনের মাঝে জীবন পার করলেও চেহারায় মলিনতা দেখিনি কোনো দিন। আমার সঙ্গে কখনো ধমকের সুরে কথা বলেনি। কোনো কিছুর জন্য বায়নাও ধরেনি। রাতে আমার দুপা ধরে অনেক কাঁদত। বলত, অসুস্থতার দরুন তো আপনার কোনো হক আদায় করতে পারিনি। আমাকে মাফ করে দিয়েন।

বাবা আরও বলেন, গর্ভাবস্থায় তো মেয়েদের অনেক কষ্ট হয়। সে সময় আমাকে গর্ভবতী মহিলাদের ফজিলত-সংক্রান্ত হাদীস শোনাত। তখন বেশি বেশি আল্লাহ পাকের প্রশংসা করত আর শুকরিয়া আদায় করত। আমি তো কিছুই জানতাম না, ও-ই আমাকে দীনি মাসআলা-মাসায়েল শিখিয়েছে। সব

সময় বলত, 'যারা অল্পে তুষ্ট থাকে আল্লাহ পাক তাদের বেশি ভালোবাসেন।' ও প্রায়ই অসুস্থ থাকত। রোগযন্ত্রণায়ও কোনো ধরনের অস্থিরতা প্রকাশ করত না। কোনো ধরনের অভিযোগ করত না। বলত, দুনিয়া তো দুঃখেরই জায়গা এরপরেও তো আল্লাহ বহু নেয়ামত দান করেছেন, অনেক শান্তির উপকরণ দিয়েছেন। তাই আল্লাহর বেশি বেশি কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে। যখন এসব কথা বলত তখনো তার পরনে ছেঁড়া-ফাটা তালিযুক্ত কাপড়। পানি ও সিদ্ধ করা সবজি খেয়েই পেটের ক্ষুধা নিবারণ করত। রোগযন্ত্রণায় বারবারই অচেতন হয়ে পড়ত। চেতনা ফিরলেই বলত, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। ইন্তেকালের রাতে হঠাৎ জোর আওয়াজে বলে উঠল,

رضينا بقضائك يا مولانا

হে প্রভু, আপনার ফায়সালায় আমরা সন্তুষ্ট।

এরপর যতক্ষণ নিশ্বাস ছিল আর কারও দিকে তাকায়নি। অসুস্থতার দশ বছর আমাকে বারবার অনুরোধ করত বিয়ে করার জন্য। বলত, আমি তো আপনার কোনো সেবা করতে পারছি না আমাকে বাপের বাড়ি দিয়ে আসুন।

অভাব-অনটন আর অসুস্থতা সত্ত্বেও বাবা কোনো দিন মাকে তার বাবার বাড়িতে রেখে আসেননি। দু-একদিন হলেই নিয়ে আসতেন।

আম্মাজানের ইন্তিকাল

দীর্ঘ এই দশ বছরের প্রতিদিনই আম্মাজান ছিলেন মৃত্যুমুখী। ছোট দুই ভাই-বোনকে কোলে নেওয়া বা দুধপান করানোর মতো কিছুই করতে পারেননি, এমনকি রাতে কাছে শোয়াতেও পারেননি। রাতে বার বার তাদের খাওয়াতে হতো। বিছানা পাল্টাতে হতো। এলাকায় আমাদের কোনো ফুফু, খালা, চাচি, মামি কেউই ছিল না। আব্বা মাঠের মাঝখানে নতুন বাড়িটি করেছিলেন যেন পর্দা-পুশিদা চলা যায়। এই বাড়িতে আমিই

ছিলাম মেয়ে মানুষ। মা-ভাই-বোনসহ সবার সেবার ভার ছিল আমার ওপর। এ কয়েক বছরে পর পর দু-ভাই মৃত ভূমিষ্ঠ হয়।

আম্মাজান আগের চেয়েও বেশি অসুস্থ। আবার সন্তান হবে। কিছুদিন আগে নানা আম্মাজানকে নৌকায় করে নিজ বাড়িতে নিয়ে যান। তখন আম্মাজানের মুখ ও গলার ভেতর ক্ষত ছিল। তাই ডাক্তার শুধু মুগডাল দিয়ে ভাত খেতে বলেছিল। নানু আম্মাজানের জন্য মুগডাল রান্না করেন। কিন্তু কে যেন মুগডাল খেয়ে গরম না করেই রেখে দেয়। আম্মাজান খেতে গিয়ে দেখেন ডাল গন্ধ হয়ে গেছে। আম্মাজানের দিকে তাকিয়ে দেখি তার দু-চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। তখন তিনি আবৃত্তি করছিলেন—

ہے یہ دنیا خانہ ویران یار/اسکوناداں ہی کرتے اختیار

বন্ধু! এ জগৎ এক বিরান প্রান্তর

মূর্খই হয় এর তরে প্রাণান্তকর

ہے یہ ویرانہ سمجھ اور غور کر/الوں اور چغدوں کے رہنے کا گھر

ভাবো, বোঝো, চিন্তা করো এত হলো নিশাচরদের বাসের ঘর

ہے یہ جنت واسطے کفار کے/فاسق وفجار وبواطر کے

এ তো স্বর্গ অসভ্য বর্বর পাপাচারীদের

اور مومن کو ہے زندان یہ جہاں/عیش اور آرام زندان میں کہاں

মুমিনের যিন্দানখানা এ জগৎ। আরাম-আয়েশের বালাই কোথায় এতে।

آشیانہ ہے ترا عرش بریں/تو پڑا ہے قید میں اندرزمیں

আবাস তোমার আরশ 'পরে

অথচ পড়ে আছ তুমি বন্দী হয়ে ভূমির 'পরে

چھوڑ کرکے اپنا خانہ زرنگار/اس نجاست پر ہے تو مفتون یار

সুখময় আবাস ছেড়ে আপনার

এই নর্দমার তরে আসক্ত হলে হে ইয়ার!

فکر کر ایسی کوئی اے بے فکر/جس سے تو اس قید سے ہووے بدر

ভাবো, হে ভাবনাহীন

কীভাবে মুক্ত হবে থেকে এ জঞ্জাল অন্তহীন

کرکے کوشش بند پاسے دور کر/اور اڑا تو آپ کو پھر عرش پر

নিজেকে করো মুক্ত অর্গল

করে চেষ্টা-তদবীর আবার উড়িয়ে তোলো নিজেকে আরশ পর।

تو پڑا خاکی کنویں میں سرکے بل/گر تو یوسف ہے کنویں سے آنکل

মৃত্তিকাকূপে পড়ে আছ হয়ে উপুড়

হয়ে থাকলে ইউসুফ তুলে আনো আপনাকে ওপর

تا عزیز مصر ربانی ہوتو/قید سے چھوٹے تو روحانی ہوتو

হও তুমি তব মিশরের অধিপতি

মৃত্যুকূপ থেকে অবমুক্ত হয়ে হও আত্মার অধিপতি।

اس نجاست پر یہ سبزہ دیکھ کر/ہوگیا مفتون تو اے خیر سر

নর্দমা 'পরে দেখে সবুজের সম্ভার

ফেতনার শিকার হলে হে আপাদ মস্তক ভালো মানুষ!

ایک دانا کیلیے اے زشت خو/جال میں تونے پھنسا یا آپ کو

একটা দানার তরে হে কদাকার

ফাঁসালে, আপনাকে অনন্ত বেড়াজালে

چھوڑ کر اصلی وطن اپنا بھلا/کوئی ویرانے میں رہتاہے پڑا

আপন সুখের আবাস ছেড়ে

রয় কি কেউ বিরান মরুভূমিতে পড়ে

واسطے تصویر بیجاں کے میاں/آپنےکو رسوا کیا اندر جہاں

নিষ্প্রাণ প্রতিমার তরে আপনাকে লাঞ্ছিত করলে ভবে

کب تلک اے شاہباز پر فتوح/تورہیگا دور از اقلیم روح

আকাশচারী হে শাহবায! আত্মজগতের রাজত্ব থেকে

আর কতকাল দূরে রইবে পড়ে

اس وطن میں ہےجووہ خود بےوطن/تو پڑا کب تک رہیگا خستہ تن

এ জগৎ যার পরবাস, তাই কতকাল আর ভুগবে তুমি কারাবাস

موڑمنہ اور تن سے جاں کو شاد کر/اپناتو اصلی وطن آباد کر

মুখ ফেরাও উদর-চিন্তা ত্যাগ করো

আপন আবাস আবাদ করো

এ কবিতা আবৃত্তির পর আম্মাজান বেশি দিন আর বাঁচেননি। ঠিকই আসল বাড়ি অভিমুখে রওনা হন। এ কবিতা বলতে বলতে অনেক কেঁদেছিলেন।

একদিন আব্বা এসে আম্মাজানকে নিজ বড়িতে নিয়ে যান। দিন দিন আম্মার অসুস্থতা বাড়তে থাকে। একমাস যাবৎ তিনি কেবল দুই-এক ফোঁটা

বার্লির পানি পান করে বেঁচে ছিলেন। শুয়েই নামায আদায় করতেন। শোয়া থেকে উঠে বসতেও পারতেন না।

শুক্রবার। ৪ঠা রজব। রাত দুইটায় প্রসব বেদনা উঠল। আম্মার খুব কষ্ট হচ্ছিল। এই গভীর রাতে ধাত্রী আনা সম্ভব হলো না। আযানের আগে ধাত্রী ছাড়াই আমার বোনটি খুব সহজেই ভূমিষ্ঠ হলো। তিনি শোয়া থেকে উঠলেন বোনটির নাড়ি কেটে গোসল করালেন। চতুর্থ মেয়ে হয়েছে দেখে খুব খুশি হয়ে তার নাম যাইনাব রাখেন। বললেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারো মেয়ের নামে এদের চারো বোনের নাম রাখলাম, হে আল্লাহ তাদেরকে নবীজীর প্রিয় বানিয়ে দিন। এই বলে খুব কাঁদলেন এবং চুপে চুপে কী যেন পড়লেন। আব্বাজান কেবল চেহারার দিকে তাকিয়েই রইলেন। অমনি তিনি যাইনাবকে আমার কোলে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে শুয়ে পড়লেন। ধীরে ধীরে শরীর থেকে তাঁর ভেজা কাপড়গুলো সরিয়ে দিলেন এবং তাকে সুন্দর করে শোয়ালেন, শরীর এতই ফুলে গিয়েছিল যে, চোখ ভেতরে চলে গেল। আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। আমাকে হাতের ইশারায় ডেকে বললেন, তোমার বোনকে একটু একটু পানি পান করাও। আমি সদ্যভূমিষ্ঠ বোনকে একটু একটু পানি পান করাই। ও সারাদিন ঘুমায়। এভাবে শুক্র ও শনিবার গেল, রবিবার সকালে ওকে রেখে আম্মাজানের কাপড় ধোয়ার জন্য পুকুরে যাই। এসে দেখি ছোট বোনটি আর দুনিয়াতে নেই। আমিই তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে দিলাম।

আব্বাজান বললেন, তোমার মাকে দেখিয়ে আনো। মৃত বোনটিকে কোলে করে তাঁর কাছে নিয়ে গেলাম।

আম্মাজান কেঁদে বললেন, আমাকে বুঝি রেখে গেলি যা আমিও আসছি। অনেক কাঁদলেন। চুপে চুপে কী যেন পড়তে লাগলেন। আব্বাজান মাঠ থেকে কিছু লোক ডেকে এনে বোনের জানাযা পড়ে দাফনকাজ সম্পন্ন করেন। নিজেদের বড় একটি ছাগল কাশিপুর মাদরাসায় দান করে আম্মাজানেরর জন্য দুআ করালেন।

মায়ের অসুস্থতা দিন দিন বাড়তেই লাগল। ছোট বোনটির আটদিন পর ১৩৭৯ হিজরি, ১৬ রজব রোজ সোমবার বেলা একটায় আম্মাজান ইনতিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁকে দাফন করতে করতে রাত বারোটা বেজে যায়। কারণ, আব্বাজান ছিলেন একা। প্রথম আম্মাজানের ইনতিকালের খবর মাদরাসায় ও গ্রামে পৌঁছালেন তারপর বাজারে কাপড় আনতে গেলেন। মামারা খাটিয়ায় করে আম্মাজানকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যান। আব্বাজান আমাকে বলে গিয়েছিলে, মা তুমি মাগরিবের নামায পড়ে ছোটদের নিয়ে তোমার মাকে শেষবারের মতো দেখে এসো। আমি মায়ের কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্র ধুইয়ে আসর নামায আদায় করলাম, এরপর ঝাড়া-মোছা করে বাড়িঘর সব পরিষ্কার করলাম, সময় হওয়ামাত্রই নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম, অভ্যাসমতো সব নামায শেষ করতেই আব্বাজানের কথা স্মরণ হলো। আর দেরি না করে ছোট তিন ভাই-বোনকে নিয়ে ঘর থেকে কাঁদতে কাঁদতে এবং দুআ পড়তে পড়তে বের হলাম।

এতক্ষণ কাজ করছিলাম আর কেঁদে কেঁদে দুআ আর কোরআন মাজীদ পড়ছিলাম। তাই বাবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। ঘর থেকে বের হতেই মনে হলো মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। আম্মাজান যেন ঘরে একা শুয়ে এখনো কাতরাচ্ছেন। ছোট ভাই-বোন তো মৃত্যু চেনে না। তারা কোনো দিন কারও মৃত্যু দেখেনি, আমিও তো কোনোদিন মৃত্যু দেখিনি। যদিও ছোট দুই ভাই মৃত ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, ছোট বোনটি দুদিন বেঁচে থেকে মারা গেছে। যখন তারা মারা গেছে, প্রাণ ঠিকই কেঁদেছিল কিন্তু কিছুই তো তখন বুঝতাম না। ছোট ভাই-বোনগুলোর কাছে তো ছিল মৃত্যু আরও অচেনা। তারা ছিল ভাবনাহীন। বড় দুই ভাই ছিলেন মাদরাসায়।

যাই হোক, নানা বাড়ি গিয়ে দেখি মাকে গাছের নিচে শুইয়ে রাখা হয়েছে। একটু দূরে নানাজান চেয়ার-টেবিল নিয়ে কোরআন মাজীদ পড়ছেন। নানাকে কিছু না বলেই চাদর উঠিয়ে আম্মাজানের চেহারা দেখলাম। তাঁর চেহারা যেন চাঁদের মতো ঝলমল করছে। এমন ঝলমলে

চেহারা আজ পর্যন্ত দেখিনি। আজও যেন সে চেহারা আমার চোখের সামনে ভাসছে। নানুকে বললাম, এখনো কেন আম্মাজানকে গোসল দিলেন না?

নানু বললেন, আমি একা কীভাবে গোসল দেব? দুই বউয়ের কেউই তো বাড়ি নেই। আমি তো পানি আনতে পারি না।

তাড়াতাড়ি পানি গরম করে মাকে গোসল করালাম। বড় মামা একটা কিতাব হাতে নিয়ে চেয়ারে বসে দেখতে লাগলেন আর আমি সুন্নাত নিয়মে মায়ের গোসল শেষ করলাম। এমন সময় আব্বাজান বাজার থেকে কাপড় নিয়ে হাজির হলেন। বড় মামা মাকে কাফন পরিয়ে দিলেন। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, বোন তুমি আমাদের আগে চলে গেলে?

আম্মাজান ছিলেন দুনো মামার ছোট। কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় সবার সঙ্গে ছোট বোন রুকাইয়াও গেল। সবাই রেখে যেতে চেষ্টা করলেও রেখে যেতে পারেনি, সে কিছুতেই থাকবে না। আব্বাজান যখন কবরে মাটি দিচ্ছিলেন তখন বোনটি কেঁদে কেঁদে বলছিল, আব্বা গো আপনি আমার মাকে কেন মাটির নিচে রেখে দিচ্ছেন।

আব্বাজান কাতর স্বরে বললেন, তুমি কেঁদো না আল্লাহ পাক আমাদের হুকুম করছেন তাই আমরা তোমার মাকে মাটির নিচে রাখছি। আল্লাহ পাক তোমার মাকে তাঁর কাছে ডেকেছেন। তুমি আর কেঁদো না।

এ কথা শুনে বোনটি কান্না বন্ধ করল। হুজুররা সবাই একেকবার একেকজন তাকে কোলে নিয়ে আদর করছিল। একজন হুজুর তাকে কোলে নিয়ে বললেন, আম্মাজানকে তো আল্লাহ পাক ডেকে নিয়ে গেছেন, এখন কার কাছে থাকবে? আপুদের কাছে থাকবে?

বোনটি বলল, আপুদের দিয়ে কী করব? যে আল্লাহ পাক আম্মাজানকে ডেকে নিয়েছেন তিনিই আমাকে রাখবেন।

তার মুখে এ কথা শুনে হুজুররা সবাই হু হু করে কেঁদে উঠল। বলল, এই বাংলার বুকে এমন মহিলা আরেক জন নাই যিনি এমন সন্তান জন্ম দেবে।

জানাযা শেষে সবাই যার যার বাড়ি চলে গেল। আব্বা ছোট ভাই-বোনদের নিয়ে নানার ঘরে খাবার খাচ্ছিলেন। আমাকেও খেতে বলছিলেন। আমি আম্মাজানকে বিদায় করেই ঘরের বাইরে একটা গাছের নিচে নামাযে দাঁড়িয়ে যাই। কেউ আমাকে ডাকেওনি। আমার সাথে কথাও বলেনি। আমি নামাযই পড়ে যাচ্ছিলাম। খাবারের জন্য না গিয়ে নামাযই পড়তে থাকলাম। কোনো উত্তরও দিলাম না।

আব্বা খাবার শেষ করে এসে বললেন, মা একটু কিছু খেয়ে নে, সারাদিন না-খেয়ে ছিলি।

আমি বললাম, জী না। এটুকু ছাড়া আর কিছু বলতে পারলাম না। কারণ, আমার তো কেবল দু-চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। কোনো কথা বলার শক্তি ছিল না। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কান্না আর দুআ সঙ্গী করে বাড়ি ফিরে এলাম।

মায়ের বিছানা খালি দেখে আমার বুকের ভেতর কিসের যেন আগুন জ্বলে উঠল বুঝতে পারিনি। শুধু অশ্রু ঝরছে। চুপে চুপে দুআ আর কোরআন মাজীদ পড়তে পড়তে ভাই-বোনদের শুইয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিলাম। হঠাৎ দেখি মা সুস্থ শরীরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে। বললেন, মা এখনো ঘুমাসনি?

আমি বললাম, আম্মাজান আপনি না মারা গেছেন! আমরা আপনাকে না দাফন করে এলাম! এখন এই অন্ধকারে কীভাবে আপনি এলেন? গোসল ও কাফনের সময় তো কিছু বললেন না?

তিনি উত্তর করলেন, তুই এমন করছিস কেন? আমি রুকাইয়ার জুতা খুঁজে দিতে এসেছি। আমি এখনই চলে যাব। আমি তো মরিনি, তুই কোরআন মাজীদের এই আয়াত ভুলে গিয়েছিস। এই বলে তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদের তোমরা মৃত মনে কোরো না। তারা বরং জীবিত, তাদের প্রতিপালকের কাছে রিযিকপ্রাপ্ত হয়।-সূরা আলে ইমরান (০৩) : ১৬৯

তাঁর সাথে আমাদের ঘর থেকে শুরু করে চতুর্দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত শুধু হুজুর আর হুজুর; সাদা জামা টুপি পরিহিত চতুর্দিক ঘেরা এবং সবাই আমার দিকে মুখ করে মায়ের সাথে এই আয়াত পড়ছিল। যখন পুরো আয়াত পড়া শেষ হলো তখন মাও নেই, হুজুররাও নেই। আজও সে দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভাসছে। মনে হয় যেন তারা এখনও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, আয়াতটি তেলাওয়াত করেছে—

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

সন্ধ্যায় মাকে দাফন করে এসে রুকাইয়ার জুতাগুলো পাইনি তাই কাঁদতে কাঁদতে তাকে কোলে করে অযু করিয়ে দিয়েছিলাম। শেষরাতে মা এসে বললেন, রুকাইয়ার জুতা খুঁজে দিতে এসেছি। আমার এই ছোট বোনটি আমাদের সব ভাই-বোনের আগে আম্মা-আব্বার সঙ্গে মিলিত হয়। আমাদের সবাইকে রেখে তার স্বামীর আগেই অল্প বয়সে পরপারে পাড়ি জমায়।

আম্মাজান তো শেষরাতে দেখা দিয়েই লুকিয়ে গেলেন। আমি ভোরে নামায পড়ি আর কাঁদি। ভাই-বোনদের কিছু কিছু লেখা-পড়া ও নামায ইত্যাদি শেখাই। নিজেও তাদের সঙ্গে কিছু কিছু পড়াশোনা করি। আব্বাজান সকালে মাদরাসায় চলে যান। আমি ছোট ছোট ভাই-বোনদের নিয়ে এই জনশূন্য বাড়িতে একা থাকি। কোনো মানুষের মুখ দেখতে পাই না।

আব্বাজান মাদরাসায় যাওয়ার পর একদিন ইশরাক পড়ছিলাম। এমন সময় ছোট ভাইটি দৌড়ে এসে বলল, আপু, অমুক হুজুর আসছে। সে ছিল আমার বাবার ছাত্র। বউ-ছেলে-মেয়ে আছে। সে আগের দিন একটা উর্দু চিঠি চুপিসারে আমার ছোট ভাইয়ের কাছে দিয়ে বলেছিল, এটি বড় আপুর

হাতে দিয়ো। কাউকে দেখিয়ো না। ভাইটি তার কথামতো চুপে চুপে আমার হাতে কাগজটা দেয়। বলে, অমুক হুজুর এই কাগজ দিয়ে বলেছে কাউকে না দেখিয়ে আপনার হাতে দিতে।

আমি বললাম, আর কোনদিন দিলে আনবে না। বলবে, আব্বাজান আমাকে মারবেন। আমি নেবো না।

চিঠিতে সে লিখেছিল, আমি বিয়ে করে বিপদে আছি। আমার স্ত্রী ভালো নয়, সে মূর্খ ও অবাধ্য। আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই। আপনি অনুমতি দিলে আমি হুজুরের সাথে কথা বলব। আপনি আমার জন্য দুআ করবেন যেন আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর মনোনীত বান্দা বানান।

গতকাল এই চিঠি দিয়ে আজই যে এসে পড়বে তা কখনো ভাবিনি। আমি তো মায়ের বিরহেই আল্লাহর দরবারে দিবা-রাত্রি কাঁদি, নামায পড়ি এবং তিলাওয়াত করি। এই লোকটির আসার কথা শুনে আমার ভাঙা বুকটা যেন ভেঙে আরও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। আমি জোরে কেঁদে বললাম, ও দয়াল গো, আমাকে রক্ষা করো।

এই বাড়িতে তো লুকানোর মতো জায়গা নেই। কারণ, ঘরে বা হাম্মামে কোথাও তো ভালো কোনো দরজা নেই। কোথায় লুকাব। আমি চৌকির নিচে গিয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়লাম। ভাই-বোনদের বললাম, সে আমার কথা জিজ্ঞাসা করলে বলবে, তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না। কারণ, শরীরের ওপর আমি একটা বড় পাটি বিছিয়ে দিয়েছিলাম। যে জন্য আমাকে দেখা যাচ্ছিল না। তাই বলেছিলাম, তোমরা বোলো, তাঁকে তো দেখতে পাচ্ছি না।

এতক্ষণে সে বাড়ির ভেতর এসে গেছে। আমি আল্লাহর ভয়ে কাঁপছিলাম। সে যদি আমার সামনে এসে পড়ে অথবা অন্যায় কিছু করে তাহলে তো একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত তাকে বিরত রাখার কেউ ছিল না। সে ঘরে ঢুকছিল। মেঝো বোনটির তখন আট বছর। তাকে দেখে ভয়ে দৌড়ে

আমার কামরায় এসে পড়ে। তাকে দৌড়াতে দেখে ছেলেটি বলে ওঠল, উম্মে কুলছুম আমাকে দেখে কেন পালায়? আমি কি শরীয়ত কম জানি?

একথা শুনে আরও ভয় পেয়ে গেলাম। বুকটা কাঁপতে লাগল। এই বুঝি সে রুমেই এসে পড়ল। কোনো রুমেই তো পৃথক দরজা নেই। কিন্তু আল্লাহ পাকের মহিমা সে সামনের রুমের খাটে বসে পড়ল। সালাম দিয়ে বলল, বোন, কথা বলতে এসেছিলাম। কথা বলবেন কি না? আশা তো ছিল অবশ্যই কথা বলবেন।

আমার কোনো সাড়া না পেয়ে সে কেঁদে ফেলল। অনেকক্ষণ চুপ থেকে বলল, আমি ভাগ্যের ওপর পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকব।

এ কথা বলে কাঁদতে কাঁদতে আমার ছোট বোনকে কোলে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। আজ পর্যন্ত সে আমার সঙ্গে কোনো প্রকার যোগাযোগ করেনি। কিন্তু একদিন এসে যে ভয়ের আগুন আমার অন্তরে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে তা আজও নেভেনি। পরম করুণাময় আল্লাহ তাকে চিরতরে বিদায় করেছেন।

আমি মা হারানো ব্যথায় এবং আকস্মিক ঘটে যাওয়া ঘটনায় দিবারাত্রি প্রভুর দরবারেই কাঁদি। দুঃখের বিষয় হলো, কিছুদিন পর তার ছোট ভাই আমার ছোট ভাইয়ের কাছে চার পৃষ্ঠার একটি চিঠি দেয়। বলে, চুপে চুপে বড় আপুকে দিয়ো। কাউকে দেখাবে না। কারও কাছে বলবে না। আমার ভাইটি ছোট্ট। সে যেভাবে বলেছে সেভাবেই আমার কাছে চিঠি এনে দেয়। তার কথাগুলোও আমাকে শোনায়। আমি চুপিসারে চিঠি পড়ি আর কাঁদি। কারণ, সেও তার ভাইয়ের মতো ঘরে এসে উঠলে আমি কী করব? তার ভাই যে চিরতরে বিদায় নিয়েছে তা তো আমি জানি না। প্রতিদিনই মনে হচ্ছে আজ বুঝি আবার এসে হানা দেবে। তার ছোট ভাইয়ের চিঠিগুলো আমার জন্য দুশ্চিন্তা আর কান্না নিয়ে হাজির হয়েছিল। লজ্জায় আব্বাজানকেও কিছু বলতে পারি না। বড় ভাই পত্রে যা লিখেছিল ছোট ভাইও তা-ই লিখেছে অর্থাৎ আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই। আপনার নেক দুআ পেয়ে ধন্য হতে চাই। না হয় আমার মতো অযোগ্য আপনার

আশা কিছুতেই করতে পারে না। আপনার অনুগ্রহ ছাড়া কিছুতেই এটা সম্ভব হবে না। পত্রে আরও বহু দুআ চেয়েছিল।

আমি কেবল খোদার দরবারে কাঁদি। এই পৃথিবীতে দুঃখ বলার মতো আমার কেউই নেই। মনের মাঝে দৃঢ় আশা ছিল আল্লাহ পাক তো মহান দয়ালু। তিনি আমার এ কঠিন বিপদ দেখছেন এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি শুধু তাঁর দরবারে ফরিয়াদ করে যাব। তিনি অবশ্যই তাঁর রহমতের কোলে আশ্রয় দেবেন। আমার এই কঠিন বিপদ দূর করবেন। যত দুআ, কোরআন মাজীদ খতম, যত প্রকারের সালাতুল হাজাত সবই আদায় করছিলাম। এ সবকিছু মামাদের কিতাবাদি থেকে চুপেচুপে নিজ খাতায় লিখে রাখতাম, আবার কিতাবগুলো চুপেচুপে রেখে আসতাম। এমন যত ধরনের কঠিন আমল আছে সবই পালন করে যাচ্ছিলাম।

একটি কিতাবে দেখেছিলাম, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি এশার নামাযের পর একা এক ঘরে অন্ধকারে অযু করে কিবলামুখী হয়ে জায়নামাযে বসে আগে ও পরে এগারো বার দুরুদ শরীফ পড়ে তিনশতবার 'লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনায যালিমিন' পড়লে যত কঠিন বিপদই হোক দয়াময় খোদা তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। তিনদিন অথবা এক সপ্তাহ কিংবা চল্লিশ দিন এই আমল একাধারে করতে হবে।

এই আমলের জন্য খালি ঘর কোথায় পাব? কারণ, একটা ভাঙা-চুরা ঘরই তো শুধু আছে, যাতে বাড়ির সবাই ভিন্ন ভিন্ন কামরায় থাকে। ছোট একটা পাকঘর যদিও আছে কিন্তু তাতে জায়গা যতটুকুই আছে কিন্তু দরজা নেই। আবার এশার পর বেশি রাত ও অন্ধকার, আবার একা, তাদের দুই ভাইয়ের এসে পড়ার ভয়, কখন কে এসে পড়ে ঠিক নেই। এসব ভেবে ভয়ে বুকটা দুরু দুরু করছিল। গভীর রাতে অন্ধকারে দীর্ঘ সময় এই ভাঙা পাকঘরে একা একা কীভাবে থাকব এই চিন্তা আমাকে পেরেশান করে তুলছে। যত আমলই করছিলাম কোনো আমলই কার্যকর হচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল না। ভাবলাম, কষ্ট করে আমলটা করলে যদি মেহেরবান খোদা দয়া করেন, এই কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা করেন। তাই খোদা পাকের ওপর

ভরসা করে, তাঁর হেফাজতের আশা নিয়ে তাঁর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করতে ভাঙা ঘরে যাই। সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে এসেছিলাম। চল্লিশ দিন ধরে এ আমল করতে থাকি। সেই অন্ধকারে একা দীর্ঘসময় থাকার ভয় আজও আমার অন্তর থেকে মুছে যায়নি। আরও কঠিন কঠিন অনেক আমল নিয়মমতো করতে থাকি। এভাবেই সময় কাটছিল।

আব্বা একদিন ছোট ভাইকে বাজারে চাল আনতে পাঠান। পথে ওই ব্যক্তির সঙ্গে দেখা। সে বলল, তুমি পারবে না, আমি চাল দিয়ে আসব। সে চাল এনে দিল। সে ভেবেছিল ঘরে তো আমি ছাড়া আর কেউ নেই। চালের ব্যাগ আর কে নেবে। তাই কিছু না বলেই চালের ব্যাগ বাড়িতে এনে আমার ভাইয়ের কাছে দিয়ে চলে গেল। আমি তখন নামায পড়ছিলাম। মাদরাসা বন্ধ থাকায় তিনো ভাই বাড়িতে ছিল। আমার দেরির কারণে মুরগি চালের থলে ছিঁড়ে ফেলতে পারে ভেবে বড় ভাই চাল থলে থেকে পাত্রে রাখছিলেন। তিনি ঘরের কাজ বুঝতেন না। আজ করুণাময় খোদা পাকই তাঁকে দিয়ে এ কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। আমি ঘরের এক কোণে নামায পড়ছি। ভাই ঘরের দরজায়। চাল রাখতে গিয়ে থলের ভেতর দুই পৃষ্ঠার একটি চিঠি পেলেন। প্রথম পত্রদাতার ছোট ভাই নিজ নাম ঠিকানাসহ পত্র লিখে চালের থলের ভেতর রেখে দিয়েছে। সে জানতে চেয়েছে, কেন আমি চিঠির উত্তর দিলাম না। আগের চিঠির মতো এই চিঠিতেও অনেক দুআ চেয়েছে। আমার মতামত জানতে চেয়েছে। অনেক বিনয়ের সাথে বারবারই বলেছে খোদা পাকের জন্য আমি অযোগ্যকে কবুল করুন। একমাত্র খোদা পাকের সন্তুষ্টির আশায় আমি আপনাকে পেতে চাচ্ছি।

ভাই তখনো উর্দু ভালো জানতেন না। আব্বাজান আরবী-ফার্সী জানলেও উর্দু জানতেন না। আম্মাজানের কাছে কিছু শিখেছিলেন। তাই একটু একটু বুঝতেন কিন্তু পড়তে জানতেন না। বাপ-বেটা দুজনেই চিঠি নিয়ে অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে কী যেন বলাবলি করল। তারা কী নিয়ে কথা বলছে তা আমি জানতাম না। নামায শেষে তাড়াহুড়া করে বিকালের

কাজ গুছাতে মনোযোগ দিলাম আর দুআ-দুরুদ পড়ছিলাম। ভাই বারবার আমার দিকে তাকায় কিন্তু কিছুই বলে না। কাজ শেষ। পুকুরে থালা-বাসন মাজা ও ধোয়ার কাজ সেরে মাগরিবের নামাযের জন্য ঘরে এলাম।

দরজায় থাকতেই ভাই ডাক দিলেন, এই শোন। আব্বাও পাশে দাঁড়ানো। তিনি কিছুই বললেন না। ধোয়া জিনিসগুলো জায়গামতো রেখে দৌড়ে এসে বললাম, ভাইজান কিছু বলবেন?

ভাই খুব রাগতস্বরে বললেন, তোর কী হয়েছে? তুই যে এমন করবি আমরা তো কল্পনাও করিনি। এখনি মাথা ফাটিয়ে ফেলব। সত্য কথা বলে দে।

আব্বাজান বললেন, তুমি এমন করছ কেন? আগে তাকে চিঠি দেখাও।

ভাই বললেন, কেন চিঠি দেখাব? ও তো সবই জানে নইলে তার কাছে চিঠি আসবে কেন?

আব্বাজান বললেন, তুমি এমন রাগারাগি করছ কেন? আগে বিষয়টা জেনে নাও।

ভাই বললেন, জানার প্রয়োজন নেই আমি সব বুঝি। সে আমাদের অপমান করতে চায়।

ভয়ে আমার বুকটা থরথর কাঁপছে। দুচোখে অঝোরে অশ্রু ঝরছে। মনে মনে শুধু দুআ পড়ছিলাম। বুঝতে পারছি না তারা কেন আমার ওপর রেগেছেন। ভাই কেন মাথা ফাটাতে এসেছেন। এশার নামায পড়ে সবাই খেতে বসল। সবাইকে খাবার দিলাম। আমি খেলাম না। সব কাজ শেষ করলাম। কান্না বন্ধ হচ্ছে না। কী হয়েছে তা তো জানতেই পারিনি। এভাবে কাঁদতে কাঁদতে সারা রাত কেটে গেল। সকালে নামায সেরে সবাইকে নাশতা দিতে এলাম। আব্বা বার বার আমার দিকে তাকালেন কিন্তু কিছুই বললেন না। এ বেলাও খেলাম না। সবাইকে খাইয়ে, সব কাজ শেষ করে যোহর আদায় করলাম। সবাইকে দুপুরের খাবার দিলাম। নিজে না খেয়েই থাকলাম। এই দিনগুলোতে না খেয়ে খেয়ে থাকতাম। আমি

ভাবতাম, নিজে না খেয়ে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির আশায় অন্যকে আহার করালে তিনি খুব সন্তুষ্ট হবেন। কয়েক বছর পর এক দিন আমার মেঝো ভাই বলল, দেহের হক আদায় করার জন্য নিয়মিত পানাহার করাও একটা ফরয। তাই নিয়মিত পানাহার না করলে এই ফরয আদায় হবে না। দেহের হকও আদায় হবে না। এমন অবহেলা পাপও বটে। এজন্য পরকালে শাস্তি পেতে হবে। তখন আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করি। সেদিন থেকে আল্লাহ পাক যখন যা ব্যবস্থা করেন তা-ই খেতে থাকি।

আবার আসি সে বিপদের ঘটনায়। দুপুরে খাবারের সময় আব্বাজান অশ্রু দেখেছিলেন। আমার পেরেশানী আমার আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানত না। কারণ, এই পৃথিবীর বুকে তো আমার কেউ ছিল না যার কাছে বলে একটু সান্ত্বনা লাভ করব। তাই ধৈর্যই ছিল আমার সঙ্গী। খাবার শেষে আব্বাজান কী যেন ভেবে বললেন, এই কাগজটা আমাকে পড়ে শোনা। দু-চোখ মুছে কাগজটা হাতে নিয়ে দেখলাম কাগজে দ্বিতীয় প্রস্তাবদাতার নাম। নাম দেখেই বললাম, আহ! আজ এক বছর ধরে যে বিপদ নীরবে সয়ে যাচ্ছিলাম দয়াময় খোদা বুঝি আজ তা প্রকাশ করলেন। আমি চিঠি পড়া শুরু করি। আব্বা আর ভাই মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকেন। ভাইজান তো কাগজের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন আমি ঠিকমতো পড়ছি কি না? পড়া শেষ হলে আব্বা ভাইকে বললেন, তুমি না বলেছ ফাতিমা চিঠি লিখেছে, চিঠি তো ওর লেখা নয়।

ভাইজান বললেন, এমন পেঁচানো লেখা ভালো পড়তে পারিনি। কিন্তু ফাতিমা তো ঠিকমতোই পড়েছে। আমি দৌড়ে গিয়ে আগের চিঠিগুলো নিয়ে এলাম। প্রথম পত্রদাতার চিঠি ছিল আরবী ও উর্দুতে। সেগুলোও একটা খাতায় দিন তারিখসহ লিখে রেখেছিলাম। কিন্তু ভয় ও লজ্জায় কাউকে দেখাতে পারছিলাম না। এখন মেহেরবান খোদা আপন কুদরতে দেখানোর ব্যবস্থা করে দেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। তার অশেষ কৃপায় সব ধরনের ভালো কাজ সম্পাদিত হয়। চিঠি ও ডায়েরি তাদের পড়ে

শোনালাম। এবারও ভাই কাগজের দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে ছিলেন আমি ঠিক পড়ছি কি না।

আব্বাজান বললেন, এর ঘটনাটা কী?

আমি বললাম, আম্মাজানের ইন্তেকালের এক সপ্তাহ পরেই সে এই চিঠিগুলো পাঠিয়েছে এবং এর পরের দিন ঘরে এসে এই কথাগুলো বলেছে। আমি চৌকির নিচে মাটিতে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে শরীরের ওপর একটা বড় পাটি বিছিয়ে দিয়েছিলাম। কারণ, সে ভেতরে এসে পড়লে আমি কোথায় পালাব। মেহেরবান খোদা তাকে সেদিকে যাওয়ার সুযোগ দেননি।

আব্বাজন খুব মনোযোগসহ আমার বক্তব্য ও চিঠির পাঠ শোনেন। বললেন, আমি এক বছর পর কেন শুনলাম? আমাকে কেন সঙ্গে সঙ্গে বললে না?

মাথা নিচু করে বললাম, ভাইজান আমার মাথা ফাটাতে না এলে আর আপনাদের হাতে চিঠি না পড়লে আমি তো জীবনেও কাউকে বলতাম না। কারণ, আল্লাহ পাক তো অবশ্যই জানেন এই বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অসহায় ও নির্দোষ। তাই আমি মহান প্রভুর কাছেই প্রার্থনা করেছি। তিনিই আজ আপনাদের সামনে তাদের স্বরূপ উন্মোচন করলেন।

আব্বাজন বললেন, সব কাগজ আমার কাছে দিয়ে দাও।

আমি দিয়ে দিলাম। ভাইজান এতক্ষণ বাবার পাশেই ছিলেন। বললেন, আমি যে ছুটিতে এতবার বাড়ি এলাম, তখনো কিন্তু তুমি আমার কাছে কিছু বলোনি। তাই তো আমি কিছু না বুঝেই তোমাকে মারতে গিয়েছি। আমি তো ভেবেছিলাম, তোমারই অন্যায়। এখন তো ব্যাপারটা বুঝে এসেছে। তুমি আমাকে মাফ করে দিয়ো।

আব্বাজান কাগজগুলো নিয়ে তাদের বাড়ি গেলেন। তাদের বাবা নেই, চাচাও নেই। মা আছেন কিন্তু তিনি লেখাপড়া জানেন না। তাদের এক চাচাতো ভাই সামান্য লেখাপড়া জানে। আব্বাজান চিঠিগুলো নিয়ে তাকে দেখালেন। কিন্তু পড়ার মতো পড়া-শোনা তার ছিল না। সে তো চিঠি

দেখেই অবাক। বলল, আমি কী করতে পারি? দুই ভাই তো ধ্বংস হয়ে যাবে।

সে দুই ভাইকে ডেকে আনল। আব্বাজান বললেন, আগে আপনি তাদের জিজ্ঞেস করুন, আমার মেয়ে তাদের সাথে কোনো কথা বলেছে কি না অথবা কোনো চিঠিপত্র আদান-প্রদান করেছে কি না?

এ কথা শুনে দুই ভাই সজোরে কেঁদে উঠল। বলল, আল্লাহ পাকের কসম! যিনি এই বোনকে নিঃসঙ্গ করেছেন আবার তার মনোনীত কাজে নিয়োজিত রেখেছেন, কোনো দিন তাঁকে দেখিও নাই, তার একটা কথাও শুনি নাই। চিঠি-পত্রের যোগাযোগ তো দূরের কথা। তিনি আমার চিঠির উত্তরও দেননি।

দুই ভাইকে পৃথক পৃথক জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা দুজন একই রকম উত্তর দেয়। তাদের চাচাতো ভাই তাদেরকে আব্বাজানের কাছে টেনে এনে বলল, হুযুর! তারা তো একই কথা বলছে। এখন আপনি তাদের বিচার করুন। আপনিই তো তাদের ইলমে দীন শিক্ষা দিয়েছেন। আপনি ছাড়া তো আমাদের কোনো মুরব্বিও নেই। আপনি আমাদের ওপর দয়া না করলে তো আমরা শেষ হয়ে যাব।

তার কথার উত্তর দেওয়ার আগেই দুই ভাই আব্বাজানের পা জড়িয়ে ধরল। কাতরস্বরে মাফ চাইল। আব্বাজান বললেন, যাও জীবনে আর কখনো এমন ভুল করবে না। পরম দয়ালু আল্লাহ পাকের ভয় সদা অন্তরে জাগ্রত রাখবে। সকল প্রকার পাপ থেকে নিজেকে পবিত্র রাখবে। তাদের আরও কিছু হিতোপদেশ দিয়ে আব্বাজান বাড়ি ফিরে এলেন। ভাইজানের কাছে সব খুলে বললেন। ভাইজান শুনে হাসলেন। আমাকে বললেন, বাড়িতে যদি কখনো কেউ আসে অথবা কোনো চিঠি দেয় সঙ্গে সঙ্গে আব্বাকে জানাবে। তাহলে সহজে সব সমাধান হবে। অন্যথায় বিপদে পড়তে হবে। কারণ, তুমি তো এসব আচরণের প্রতিবাদ করতে পারবে না। আমি মাদরাসায় থাকলে চিঠি দিয়ে জানাবে। আমি আব্বাজানকে জানাব। কোনো সমস্যা এমনভাবে আর কখনো চেপে রাখবে না।

ভাইয়েরা চট্টগ্রাম চলে গেল। তারা সেখানে পড়াশোনা করত। আব্বাজান আমার কাছে সব চিঠি দিয়ে বললেন, হেফাজত করে রেখো। হেফাজত করেছিলে বলেই এক বছর পরে হলেও কাজে এসেছে। আমি আবার আগের মতো এগুলো নাম লিখে রেখে দিলাম। চিঠিগুলো হয়তো এখনোও থাকত কিন্তু ভাইয়েরা মাদরাসা থেকে এসে আমার কিতাব, কাগজপত্র খুলে খুলে পড়ত আর এলোমেলো করে রাখত। বাচ্চারা এসব নষ্ট করত। আমি বারবার গুছিয়ে রাখতাম। এমন করতে করতে একসময় দেখি আমার লেখা অনেক খাতা, চিঠিপত্র ও প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই নেই। কোথায় হারিয়ে গেছে খোদা পাকই জানেন।

২১ আশ্বিন ১৩৫১ বাংলা শুক্রবার দিবাগত রাতে নানাবাড়িতে আমার জন্ম। ১৩৫২ বাংলা ভাদ্র মাসে আব্বাজান আপন পিত্রালয় নোয়াখালী ছেড়ে এখানে আসেন। তৎকালীন বেগমগঞ্জ বর্তমান চাটখিল উপজেলার ঐতিহ্যবাহী মিয়া বাড়ীর সন্তান ছিলেন তিনি। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য পরিবার ছিল তাদের। আব্বাজান বলেছেন, দুটি উদ্দেশ্যে আমি বাপ-দাদার বিশাল সম্পত্তি ছেড়ে এ জনশূন্য অঞ্চলে এসেছি :

এক. তোমার আম্মাজানকে শরয়ী পর্দা-পুশিদায় রাখা।

দুই. কাশিপুর মাদরাসায় খেদমত করে জীবন কাটানো এবং এখানকার ছেলেমেয়েদের ইলমে দীন শিক্ষা দেওয়া।

মাদরাসাটি আমাদের নতুন বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখান থেকে এক সময় বহু বড় বড় আলেম তৈরি হয়েছে। আমার সন্তানদের বাবা এ মাদরসায় পনের বছরেরও বেশি সময় শিক্ষকতা করেছেন।

আব্বাজান সারাজীবনই মাদরাসার একজন না-একজন ছাত্র জায়গির রাখতেন। আমাদের দিন বহু কষ্টে শাক-ভাত খেয়ে কাটত। তবুও ছাত্র জায়গির রাখতেন। বলতেন, মাদরাসার ছাত্ররা আল্লাহর মেহমান। নিজেরা

কষ্ট করে আল্লাহর মেহমানকে খাওয়ালে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের অনেক কিছু দেবেন। অনেক ইলম দান করবেন।

আব্বাজান বলেছেন, 'তোমার আম্মা বাপের বাড়ি থেকে এনে আমাকে খাইয়েছেন, পরিয়েছেন। সর্বদা আমাকে নেক কাজে অনুপ্রাণিত করেছেন। সুন্নত তরিকায় জীবনযাপন ও তার ফযিলত এবং অল্পে তুষ্ট থাকলে কী কী মর্যাদা লাভ হবে তা আমাকে শিখিয়েছেন।'

আমার বয়স যখন এগারো মাস তখনকার ঘটনা। এক রাতে আমি খাট থেকে পড়ে যাই। আমাকে বড় ভাইয়ের রুমে রেখে আব্বা-আম্মা নানা বাড়ি গিয়েছিলেন। আমাদের বাড়ি থেকে নানা বাড়ির দূরত্ব পাঁচ মিনিটের। আব্বা-আম্মা কিছুক্ষণ পরই ফিরে আসেন। এসে দেখেন ঘরের দরজা বন্ধ। এক মাত্র বড় ভাইও শুয়ে আছেন। কিন্তু আমার বিছানা খালি। আব্বা-আম্মা অস্থির হয়ে পড়লেন। ঘরে বাইরে পুরো বাড়ি খুঁজেও আমাকে পেলেন না। আব্বা নিরুপায় হয়ে নানাকে জানান। তিনিও পেরেশান হয়ে পড়েন এবং দুআ-দরূদ পড়তে থাকেন। এভাবেই প্রায় তিন ঘণ্টা কেটে যায়। হঠাৎ দরজার আড়ালে কান্নার শব্দ শুনে ছুটে গিয়ে দেখেন আমি পড়ে আছি। আব্বা আবার নানাকে গিয়ে আমাকে খুঁজে পাওয়ার সংবাদ জানান। সংবাদ শুনে নানা আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করেন এবং দুআ করেন।

এর কিছুদিন পর আমি পুকুরে ডুবে যাই। আব্বা আমাকে উদ্ধার করেন। এরপর আরও দুই বার আমাকে পানি থেকে ওঠানো হয় মৃতপ্রায় অবস্থায়। দীর্ঘক্ষণ পর নড়াচড়া অনুভূত হয়।

আমার বয়স যখন দুই বছর তখন একবার সবার সঙ্গে খাবার খাই। আমি সুস্থই ছিলাম। খাবারের পর আর বসা থেকে উঠতে পারছিলাম না। আমি কাঁদতে থাকি। আব্বা-আম্মাও কাঁদেন। আব্বা আমাকে নানার কাছে নিয়ে যান। ঝাড়-ফুঁক করেন। কিন্তু কোনো কাজ হয় না। আমি কেঁদেই চলেছি। কিছু বলতে পারি না, হাঁটাচলা করতে পারি না, দাঁড়াতেও পারি না। এ অবস্থায় তিন দিন কেটে যায়।

চতুর্থ দিন আসরের নামাযের পর আব্বা আমাকে কোলে করে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দুআ পড়ছেন। এমন সময় বাড়ির বাইরে মাঠের দিক থেকে এক লোক হাতের ইশারায় আব্বাকে ডাকলেন। লোকটি দেখতে ছিল খুবই সুন্দর। পরনে সাদা জামা, টুপি ও পাগড়ি। আব্বা তাড়াহুড়ো করে আমাকে কোলে করেই লোকটির কাছে গেলেন। সালাম করলেন। লোকটি কিছু না বলেই আমার দিকে হাত বাড়াল। আমি লোকটার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। লোকটি আমার শরীরে হাত বুলিয়ে আব্বার কোলে দিয়ে দিল। এরপর লোকটি চলে গেল। তাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। আব্বা আফসোস করতে করতে বাড়িতে প্রবেশ করলেন, এমন একজন মানুষ পেয়েও মেয়েটার জন্য দুআ করাতে পারলাম না। আমি তখন আব্বার কোল থেকে জোর করে নেমে হাসতে হাসতে দৌড়ে ঘরে ভেতর চলে গেলাম। আম্মা তো দেখে অবাক। আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করলেন। আব্বা নানার কাছে পুরো ঘটনা খুলে বললেন। এসবই আব্বা আম্মার কাছ থেকে শোনা।

আমার ছয় বছর বয়সে আম্মার খুব অসুস্থতা দেখা দেয়। এক সময় তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। কখনো জ্ঞান থাকে কখনো থাকে না। এভাবে দীর্ঘ দশ বছর কেটে যায়। এ সময়ই আমার পাঁচ ভাইবোন জন্মগ্রহণ করে। দুজন মৃত জন্মগ্রহণ করে। একজন দুদিন পর মারা যায়। আর বাকি দুজন বেঁচে থাকে।

সংসারের পুরো দায়িত্ব তখন আমার কাঁধে। আম্মার সেবা, ভাই-বোনের যত্ন, ঘরের খাবার রান্না, মাদরাসার ছাত্রদের খাবারের ব্যবস্থা, আম্মা ও ছোট ভাই-বোনের পায়খানা-প্রস্রাব পরিষ্কার করা এবং খাওয়ানো, গোসল করানো—এই ছিল আমার দৈনন্দিনের রুটিন। একটু এদিক-ওদিক হলেই সবার বকা শোনা, মার খাওয়া এবং নীরবে অশ্রু ঝরানো—এভাবেই কেটে যাচ্ছিল আমার দিন। আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাকই জানেন, কীভাবে এত ছোট্ট একটি মেয়েকে দিয়ে তিনি শয্যাশায়ী একজন রোগী ও ছোট ভাই-বোনসহ গোটা একটি পরিবারের সব দায়িত্ব পালন করিয়েছেন। কে তাকে

এ নিয়ম-শৃঙ্খলা শিখিয়েছে? আশপাশে কোনো দাদি, নানি, খালা, ফুফু, মামি, চাচি, জেঠি কিংবা একটি বোন বা ভাবী নিদেনপক্ষে পরামর্শ দিতে পারে এমন একজন মহিলাও ছিল না। শুধু শয্যাশায়ী মায়ের কাতর কান্না আর দুআ ছাড়া এ বাড়িতে আর কোনো মহিলার আওয়াজ শোনা যেত না।

কোনো মহিলা ভিক্ষার জন্য এলে আম্মাকে বলত, আপনি যখন অসুস্থ তখন কাজের জন্য একজন মহিলা রাখতে পারেন না! এ ছোট্ট মেয়ে কীভাবে সংসারের এত কাজ করে! পরিশ্রম করে করে যেমন দুর্বল হয়ে গেছে ও তো আর বড় হবে না। বেঁচে থাকলে কি বিয়ে-শাদী দিতে হবে না। আপনারা একজন কাজের লোক রাখুন। মেয়েটার ওপর আর জুলুম করবেন না। মেয়েটার এ দুঃখ-দুর্দশা দেখলে আমার কান্না আসে। ছোট ভাই-বোনেরা ওকে মারে। ও নীরবে কাঁদে আর খাটা-খাটনি করে। কাউকে কিছু বলে না। কখনো রাগও করে না। মা, তোর কপাল ভালো হবে গো!

ভিক্ষুক মহিলারা এসব বলে চলে যেত আর আমিও সংসারের জন্য খেটে যেতাম।

আমার যেদিন ছয় বছর পূর্ণ হলো সেদিন আম্মা আমাকে ডাকলেন। আম্মা তখন বিছানায় শোয়া। বললেন, 'তোর তো আজ ছয় বছর পূর্ণ হয়েছে। এখন থেকে নামায পড়তে হবে। এভাবে ওযু করবি। সব সময় শরীর-কাপড় পাক রাখবি। কাপড়ে বা শরীরে প্রস্রাবের ছিটা পড়তে দিবি না। প্রস্রাবের ছিটার জন্য কবরে ভীষণ শাস্তি হয়। সর্বদা ওযু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করবি। আল্লাহ পাক পবিত্রতা অর্জনকারীদের খুব ভালোবাসেন। ওযু অবস্থায় মারা গেলে শহীদের মর্যাদা লাভ হয়। মা, তুই আল্লাহ পাককে ভয় করিস আর তাঁর রহমতের আশা রাখিস। তিনি তোকে দয়া করবেন। আমি তো তোর জন্য কিছুই করতে পারিনি। খোদার হাতেই তোকে সোপর্দ করলাম।'

একথা বলে আম্মা খুব কাঁদলেন। চোখের পানিতে বালিশ ভিজে গেল। এভাবে কাঁদতে কাঁদতেই শোয়া অবস্থায় ওযু করার পদ্ধতি দেখালেন। পানি ছাড়াই শরীরে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ওযু দেখালেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে পুকুর

থেকে ওযু করে আসি এবং নামাযে দাঁড়াই। আম্মা শুয়ে শুয়ে নামাযের তাকবীর, সূরা, দুআ, তাসবীহ ইত্যাদি বলছিলেন। আমি জোরে জোরে পড়ছিলাম। ফজর থেকে ইশা পর্যন্ত সব নামাযের নিয়ম ও দুআ-কালাম বলে দিলেন। আমি জোরে জোরে পড়লাম। আম্মা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলেন। একটি কাঠি দিয়ে দুপুরের ছায়া মেপে আনতে বললেন। এরপর জোহর ও আসরের নামাযের ওয়াক্ত বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, মা যতদিন বেঁচে থাকবি সময় হওয়ামাত্রই নামায পড়ে নিবি। নামাযের সময় হলে কখনো দেরি করবি না। তখন এমন আরও অনেক উপদেশ দিলেন।

রাতে মাঝেমধ্যেই ঘুম থেকে জেগে ওঠতাম। উঠেই নামায শুরু করতাম। আম্মা শুয়ে শুয়ে বলতেন, 'এখন ঘুমিয়ে পড়, এখনো নামাযের সময় হয়নি। সময় হলে তোকে ডেকে দেব।' এভাবেই আমার রাত পার হতো। ফজরের আযান হলে কেউ না ডাকতেই ঘুম থেকে উঠে যেতাম। অন্ধকারে পুকুর থেকে ওযু করে আসতাম। এসে জোরে নামায পড়তাম ও মুনাজাত করতাম। মা শুয়ে শুয়ে বলতেন, কী পড়ছিস? আমি বলি তুই শোন।

বললাম, আমি পড়ি আপনি শুনুন। ভুল হলে বলে দেবেন।

সেদিন সব নামায ওয়াক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করলাম এবং আম্মাকে পড়ে শোনালাম। কোনো ভুল হয়নি।

আম্মা বললেন, এখন থেকে চুপি চুপি পড়বি আর ঠিকমতো পড়বি। আল্লাহ আমাদের নামায দেখেন, ভালোভাবে না পড়লে তিনি অসন্তুষ্ট হন। এ কথা বলে, আম্মা খুব কাঁদলেন এবং নিচু স্বরে কী যেন পড়লেন।

এই যে নামায শুরু করলাম, কত বাধা ঠেলে, কত কষ্ট করে এ নামায অব্যাহত রাখলাম। রাতে ছোট ভাই-বোনেরা প্রস্রাব করে শরীর-কাপড় নাপাক করে দিত। আমি ঝড়-তুফান-শীত সব সময় সে ছোট বয়স থেকেই শরীর পাক করে নামায পড়তাম। লেখাপড়া তো কিছুই জানতাম না। শুধু

আম্মার দিক-নির্দেশনাগুলো মনে রাখতাম। আম্মা যে বলেছিলেন, শরীর ও কাপড় পাক রাখবি সে থেকেই আমি এ ব্যাপারে যত্নবান।

এ সময় আমার মনে পড়াশোনার প্রচণ্ড আগ্রহ জাগে। একদিন আব্বাকে বললাম আমাকে কি পড়াবেন না? ভাইয়েরা তো মাদরাসায় পড়ে আমি কি পড়ব না?

আমার কথা শুনে আব্বা কেঁদে ফেললেন। বললেন, আল্লাহ পাক তোমার আম্মাকে সুস্থ করলে তখন পড়বে। এখন তোমার আম্মার সেবা করো।

আমি কেঁদে ফেললাম। বললাম, আমাকে হরফগুলো শিখিয়ে দেন।

আব্বা কিছু না বলে গাছ থেকে কলা পাতা ছিঁড়ে আনলেন। নারকেল গাছের একটি শলা দিয়ে আরবি, বাংলা অক্ষরগুলো লিখলেন। এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো লিখলেন। এরপর মুখে মুখে পড়াতে লাগলেন। এর মধ্যেই ছোট ভাইটি কেঁদে উঠল। আব্বা বললেন, আজ যা, আরেকদিন পড়াব।

আমি মন খারাপ করে উঠে গেলাম। সংসারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। পাতাগুলো সযত্নে তুলে রাখলাম। কিন্তু পাতা শুকিয়ে গেলে আর লেখা দেখা গেল না। আমি অস্থির হয়ে পড়লাম। আব্বাকে আবার লিখে দিতে বললাম। আব্বার আর সুযোগ হয় না।

একদিন চুপে চুপে নানা বাড়ি যাই। টেবিলের ওপর থেকে কায়দা ও কয়েকটি বাংলা-অংক বই নিয়ে আসি। কাঁথার নিচে লুকিয়ে রাখি। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে বইগুলো নিয়ে পড়তে বসি।

একদিন আব্বা মাদরাসা থেকে ফিরে বাইরে বাতাসে বসলেন। আমি একটি পাতা ও শলা নিয়ে হরফগুলো লিখে দেখালাম এবং পড়ে শুনালাম। বাংলা ও আরবি সংখ্যা দেখে ও শুনে হাসলেন। বললেন, মা, এখন আর জ্বালাতন করিস না। তোর মা সুস্থ হয়ে নিক তখন পড়িস। এখন তো

এগুলো শিখেছিস। এবার আল্লাহ চাহে তো সব পড়াই শিখতে পারবি। এখন যা, তোর মায়ের কিছু লাগবে কি না দেখ। তোর ভাই কাঁদছে ওকে গিয়ে খাবার দে।

আমি কাঁদতে কাঁদতে চলে এলাম। কিন্তু আজ আমি আব্বার কাছ থেকে যের, যবর, পেশ এবং শব্দগঠনের নিয়ম শুনে নিই। নিজে নিজে চেষ্টা করে কায়দা ও বইগুলো শেষ করি। এরপর আবার মামা বাড়ি যাই। আগেরগুলো রেখে একটি আলিফ লাম ও একটি উর্দু কিতাব নিয়ে আসি।

এরপর শুরু হয় পড়া। রান্না-বান্না, মাছ কাটা, ধোয়া-মোছা, আম্মা ও ভাই-বোনদের খাওয়ানোর ফাঁকে পড়ি। সারাক্ষণই পড়ার মধ্যে থাকি। কেউ এসে ধাক্কা দেয় তো কেউ এসে লাথি দেয়। কেউ আবার কিল-ঘুষি দেয়। বলে, 'এখন কিসের পড়া? পড়ার সময় কোথায় ছিলে? এখন কাজের সময় পড়ার ভান করছ। বলে, ও আবার কোন দিন পড়তে শিখল? আব্বাজান না বলেছেন আম্মা সুস্থ হলে ওকে পড়াবেন। কিন্তু ও এখন আলিফ লাম পড়ে কেন। আবার বড় বড় কিতাবও রেহালে রাখে। রুকেয়া ছিঁড়ে ফেললে তো মামা মারবেন। ওইদিন মামাদের বাড়ি থেকে বই চুরি করে এনেছে। মামাজান ওরে টেবিলের কাছে দেখে মারতে গিয়েছিলেন। কেঁদে ফেলেছিল বলে মামা মারেনি। তবুও সে বই এনেছে। মামা সরে যাওয়ার পর লুকিয়ে ছন খেতে রেখে দিয়েছে। আসার সময় সেখান থেকে নিয়ে এসেছে।'

বড় ভাই আম্মাজানকে গিয়ে বলল, ও তো কায়দাই পড়েনি এখন রেহালে আলিফ লাম ও কিতাব নিয়ে রাখে কেন?

– সে এখন কোথায়?

– সে তো ভাত রান্না করছে। আর বার বার রেহালের দিকে তাকায়। কেঁদে কেঁদে শুধু ঠোঁট নাড়ে।

– সে কাঁদে কেন?

– দেখেছি, সাইফুল্লাহ আর কুলসুম ওকে ধাক্কা দিচ্ছে আর লাথি মারছে। আমি শুধু কিল দিয়েছি। কারণ, ও আল্লাহর কালাম চুলার পাশে নিয়ে রেখেছে। আমরা তো ওখান দিয়ে হাঁটাচলা করি। ওখানে কোরআন নেওয়া কি ঠিক হয়েছে আম্মা?

– বাবা, আল্লাহ পাক তোমাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। তুমি এগুলো এনে উঠিয়ে রাখো। আমি উঠতে পারলে ওর চামড়া উঠাব।

বড় ভাই দৌড়ে এসে বলল, এই শোন, আম্মার কাছে সব বলে দিয়েছি। আম্মা বলেছেন, তোকে মারবেন।

আমি এতক্ষণ চুলার কাছে বসে সবই শুনছি আর কাঁদছি। ভাইজান এ কথাগুলো বলে রেহাল নিয়ে গেল। আমি দ্রুত রান্না শেষ করে সবাইকে খাবার দিলাম। দেখলাম, রেহালটা ঘরের এক কোণে খোলা জায়গায় পড়ে আছে। সবার খাওয়া শেষ হলে ছোটরা খেলাধুলায় মগ্ন হয়ে গেল। বড় ভাই ও ছাত্ররা মাদরাসায় চলে গেল। আম্মা ঘুমিয়ে পড়লেন।

এ সুযোগে আমি কিতাব আর আলিফ লাম নিয়ে রান্না ঘরে লাকড়ির নিচে লুকিয়ে রাখলাম। সেখান থেকে বের করে সারাদিন কাজের ফাঁকে পড়তে থাকি। এভাবে সারাদিন মুখস্থ করি। শুদ্ধ হয় না ভুল হয় জানি না। যার জন্য পড়ি শুধু তিনিই জানেন আমি কী পড়ছি।

আমি সারা রাত কাঁদি আর বলি, হে আল্লাহ, আমি দুঃখিনী আপনার জন্য পড়ছি। আপনি আমাকে আপনার খুশিমতো পড়ার তাওফীক দান করুন। আমার জন্য ইলম শেখা সহজ করে দিন।

রাতে ও সকালে ছাত্ররা যখন কাছারিতে জোরে জোরে পড়ে তখন আমি কাছারির পেছনে লুকিয়ে চুপে চুপে তা মুখস্থ করি। নিজের পড়ার সঙ্গে মিলিয়ে নিই। এভাবে রাত-দিন পড়াশোনা চালিয়ে যাই। পড়া ছাড়া কিছুক্ষণ সময়ও কাটাতে ভালো লাগে না।

আম্মা নানা বাড়ি গেলে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সেখানে গিয়ে মামাদের কিতাবের টেবিল ও আলমারির কাছে গিয়ে চুপে চুপে বসে

পড়তাম। একদিন মামা আমাকে টেবিলের কাছে দেখে আম্মাকে বললেন, ফাতিমা কী পড়ে?

– ভাইজান, ফাতিমাকে তো কিছু পড়াতে পারিনি।

– তাহলে সে কিতাবের টেবিল ও আলমারির কাছে সারাক্ষণ কী করে? কিতাব খুলে খুলে নষ্ট করে। কিছু বললেও শোনে না। নিষেধ করলেও মানে না।

– ভাইজান, ও বাড়িতেও এমন করে। লাকড়ির ভেতরে, পাতিলের নিচে, গাছের চিপায় কিতাব লুকিয়ে রাখে। ভাই-বোনের কত মার খায়। পড়ালেখা শেখার জন্য অনেক কাঁদে। কিন্তু আমার অসুখের কারণে তো ওর সর্বক্ষণই সংসারের কাজ করতে হয়। আমারও সেবা করতে হয়।

মামা আমাকে বললেন, তোর আম্মা সুস্থ হলে পড়িস। এখন কিতাব ধরে নষ্ট করিস না।

একথা শুনে আমার খুবই কান্না পেল। এবারও লুকিয়ে কিতাব নিয়ে এলাম। সব কিছু উপেক্ষা করে পড়তে থাকলাম। রাতে হারিকেনের তিন দিকে কাপড় দিয়ে ঢেকে চুপি চুপি লিখতাম। কারও শব্দ পেলে হারিকেন নিভিয়ে দিতাম। এভাবে পড়তে পড়েত নাহু-সরফের সবগুলো কিতাব মুখস্থ করি। অনেক আরবি মুফরাদাত-শব্দ মুখস্থ করি। মাদরাসার পাঠ্যসূচির সবগুলো কিতাব লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে ফেলি। পাশাপাশি কোরআন মাজিদ হিফজ শুরু করি। ঘরে কোরআন মাজীদের বেশি কপি ছিল না। আম্মা-আব্বার দুটি ছাড়া আরেকটি হাফেজী কোরআন শরীফ ছিল। তা ছিল বেশ পুরোনো ও ছেঁড়াফাটা। এর পৃষ্ঠাগুলো একত্র করে ছোট করে বেঁধে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তে থাকি। এভাবে পরবর্তিতে একসময় সম্পূর্ণ কোরআন মাজীদ হিফজ হয়ে যায়।

দিন দিন আম্মার অবস্থা খারাপ হতে থাকে। পরপর তিন ভাই-বোনের জন্ম হয়। দুজনই মৃত ভূমিষ্ঠ হয়। শেষের জন দু'দিন বেঁচে থেকে মারা

যায়। আটদিন পর আম্মার ইন্তেকাল হয়। আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। রাত-দিন কাঁদি আর ভাইবোনদের সেবা করি। লেখা-পড়া চালিয়ে যেতে থাকি। এতদিনে আমার লুকিয়ে লেখা-পড়ার বিষয়টি ধরা পড়ে। কোরআন শরীফ, উর্দু-ফার্সী পাঠ্যবইগুলো ছোট ভাইদের অর্থসহ পড়াই। তখন এক ভাই নাহবেমীর আরেক ভাই মীযান পড়ত।

বাবা দেখে অবাক হতেন। কিছুই বলতেন না। একদিন বাড়িতে মামা আসেন। আব্বা বললেন, ভাইজান, ফাতেমাকে তো কোনো লেখা-পড়া করাইনি। কিন্তু ভাই-বোনদের কত সুন্দর করে পড়াচ্ছে। কোত্থেকে সে শিখল? কীভাবে শিখল?

মামা বললেন, আমাদের টেবিলেও একটা সুন্দর ফার্সী লেখা কাগজ পেয়েছি। মনে হয়, সে-ই লিখেছে। কারণ, আমাদের ঘরে তো আমি ছাড়া আর কেউ উর্দু-ফার্সী জানে না। আমারও প্রশ্ন, সে শিখল কীভাবে? দিন-রাত তো মা ও ভাই-বোনদের সেবা করেছে।

আব্বা বললেন—ভাই, দুআ করুন আল্লাহ যেন ওর জন্য ভালো পাত্র মিলিয়ে দেন। আমি পর্দার আড়াল থেকে সব কথাই শুনতে পাই। ওখান থেকে সরে এসে আল্লাহ পাকের দরবারে খুব কাঁদলাম। তিনি যেন আমাকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী করেন।

কিতাবে পড়েছি, 'আল্লাহ পাক উত্তম চরিত্রের অধিকারীদের বেশি ভালোবাসেন।' তাই উত্তম চরিত্রের জন্য খোদা পাকের দরবারে সর্বদা আরজি পেশ করি। ৬৬ বছর ধরে কেঁদেই চলেছি। কিন্তু আখলাক-চরিত্র আর কতটুকু ভালো করতে পেরেছি।

বিবাহ

ভাইয়েরা তখন মাদরাসায়। একদিন আব্বার কাছে কাশিপুর মাদরাসা থেকে দু'জন শিক্ষক এলেন। অনেকক্ষণ পর আব্বা ঘরে এসে বললেন, আজ দীর্ঘ দশ মাস ধরে তারা আমাকে বিরক্ত করছে। আজ তাদের

বাড়িতে (সরসপুর) যেতে জোরালো অনুরোধ করেছে। আল্লাহ পাকের ওপর ভরসা করে যাচ্ছি। তুমি দুআ করো যেন আল্লাহ পাক উত্তম ফায়সালা করেন। আব্বার বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত হলো। তিনি বিয়ের কথাবার্তা পাকাপাকি করে এলেন। বললেন, দু'দিন পর বিয়ে। তুমি ইসতেখারা করে নাও। আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্তের ওপর রাজি হয়ে যাও।

আমি চুপ ছিলাম। দশ মাস আগেই প্রস্তাবটি আসার পর আমি ইসতেখারা করেছি। তা তো আর কেউ জানে না। তিনি যে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে প্রতিদিন মাদরাসায় আসা-যাওয়া করতেন কোনো দিন তিনিও আমাকে দেখেননি আর আমিও তাঁকে দেখিনি। কোনোপ্রকারের যোগাযোগও কোনোদিন হয়নি। শুনেছি, যোগ দেওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই তিনি কাশিপুর মাদরাসার সবচে প্রিয় উস্তাদ ও ছাত্রগড়ার কারিগর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বিয়ের মাত্র দুই দিন বাকি। আব্বাজান একাই সব করছেন। ভাইয়েরা তো মাদরাসায়। আব্বাজান একা কীভাবে সামলাবেন তা-ই নিয়ে আমি চিন্তিত। ভাইদের আনার জন্য চট্টগ্রামে লোক পাঠালেন। ইতিপূর্বে আমাকে পত্র লেখা আব্বাজানের শাগরেদ দু-ভাই ছুটে এল। বলল, হুজুর কী কী কাজ করতে হবে আমাদের বলুন আমরা সব করে দেব ইনশাআল্লাহ। আব্বাজান খুব খুশি হলেন। বললেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। হঠাৎ করে কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে।

তারা বলল, হুজুর আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আল্লাহ পাক সব সহজ করবেন। তারা এ দুদিনেই বিয়ের সব কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সমাধা করল। আব্বাজান বললেন, তারা দুই ভাই এমন নিষ্ঠার সঙ্গে সব কাজ করছে মনে হয় ইতিপূর্বে কিছুই হয়নি। মনে যেন তাদের আনন্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। আল্লাহ পাক তাদের দু-জাহানে সফলতা দান করুন। আমি নিরিহের প্রতি তারা এহসান করেছে।

১৩৮১ হিজরি ১৭ রজব সোমবার বিয়ে হলো। সেদিনই আমাকে সরসপুরে নিয়ে গেলেন। শুক্রবারে ভাই আমাকে নিতে এল। বলল,

নানাজান অসুস্থ। আপনাদের দু'জনকে দেখতে চাচ্ছেন। ঠিক হলো যাওয়ার পথে নানার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাব। নানাবাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে জুমার সময় হয়ে গেল। তিনি ভাইকে বললেন, আমি মসজিদে জুমা পড়ে নিই। এর মধ্যে বোনকে নিয়ে মসজিদে আসুন নামায শেষ করে রওয়ানা হব। বাড়ির পাশেই ছিল মসজিদ। ঘরে গিয়ে দেখি আমাকে দেখতে নানা বাড়িতে অনেক মহিলা অপেক্ষা করছে। তাড়াতাড়ি নানা-নানুর সঙ্গে মুসাফাহা করে ঘরের বাইরে জায়নামায বিছিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে যাই। মহিলারা আমাকে খুঁজতে খুঁজতে বাইরে আসে। নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল। নামায শেষে তাদের সঙ্গে সালাম-মুসাফাহা করে আবার নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম। মহিলারা নিচু আওয়াজে কী যেন বলতে বলতে চলে গেল। আমি নামায শেষ করে মাত্র জায়নামাযটা হাতে নিলাম এর মধ্যে ভাই এসে বলল আসুন, আমাদের নামায শেষ। নানা ও নানুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

আমার পৌত্র স্নেহের মুহিব্বুল্লাহ ভাইজান জীবনের নানা দিক নিয়ে লিখতে বলেছে বলে এসব কথা লিখছি। কখনোই হয়তো লিখতাম না। এসব কথা কোনোদিনই কাউকে বলিনি। নামাযের কথা লেখার কারণ হলো, আমার সন্তান ও তাদের সন্তানরা যেন এভাবে সময় কাজে লাগায়। সময়ের সদ্ব্যবহার করে। অল্প সময়ে বেশি কাজ করে। সকল প্রকার বিপদ-আপদে, দুঃখ-কষ্টে যেন খোদা পাকের ওপর অটল বিশ্বাস রাখে। শুধু তাঁরই দরবারে ফরিয়াদ করে।

সরসপুর এসে দেখি বাড়ির চতুর্দিকে বেড়া দিয়ে ঘেরা। কিন্তু বাড়ির ভেতর অন্যান্যদের মধ্যে শরঈ পর্দা নেই। এ অবস্থা দেখে বাগানে চলে যাই। বাগানে পরপুরুষের আনা-গোনা ছিল না। সেখানে আল্লাহর দরবারে লুটিয়ে পড়ি। তাঁর দরবারে কাঁদি, সেজদায় ফরিয়াদ করি। পর্দার এ অবস্থা নিজ বাড়ির কাউকে জানাইনি। স্বামীকেও কিছু বলি না। কাউকেই কিছু বলি না। খোদার দরবারেই দুআ করি। এদিকে অনেক বকাও শুনি। বকা-ঝকা কখনো মারের পর্যায়ে যেতে চাইত। আমাকে বাগানে দেখে মহিলারা

বলে, ছি ছি তোমার ঘেন্না করে না! বাগানে কত কুকুর-বিড়ালের আনাগোনা এখানে কীভাবে সেজদা করো?

উত্তর দিলাম, তাহলে আমি কোথায় থাকব? ঘরেও পুরুষ, রান্নাঘরেও পুরুষ!

মহিলারা বলল, ও মা এরা বুঝি পরপুরুষ! এরা তো আমাদের অমুক অমুক।

আমি বলতাম, তাহলে কি এরা মহিলা হয়ে গেছে?

উত্তর এল, মহিলা তো হয় নাই। কিন্তু তুমি কি আপনলোকের সাথেও পর্দা করবে? নিজের কাজ নিজে করবে। কাজে ফাঁকি দেওয়ার জন্য পুরুষের ওসিলা বের করছ? মাওলানাকে বিয়ে করিয়ে এই বাড়ির মান ইজ্জত সব ডুবল। এখন গোসল না করে ঘরের কিছু ধরতে দেবে না। এতক্ষণ নাপাক জায়গায় ছিল গোসল না করে যেন ঘরে না ঢোকে।

এভাবে আরও বছর কয়েক বকা-ঝকা আর যন্ত্রণা অব্যাহত থাকে। আব্বা ও ভাইয়েরা কেউ জানে না। জানে না স্বামীও। সারা গ্রামের মেয়েরা আমার কাছে নামায-রোযা শিখতে আসে। কোরআন-কিতাব পড়ে। সকালে শুধু এক ঘণ্টা পড়াতাম। ছোট ছেলেরাও পড়তে আসত। এই পড়ানোর জন্যও অনেক বকা শুনতে হয়েছে। অনেক কথা সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু কেন যেন আমার মাঝে কোনো বিরক্তি ছিল না। উৎসাহে কোনো কমতি ছিল না। সবার সেবায় সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকি। উৎসাহে ভাটা না পড়ার কারণ ছিল, আমি সব সময় মনে করতাম, মন্দের পরিবর্তে ভালো করলে আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হবেন। তিনি সন্তুষ্ট হলে আমাকে তিনি দয়া করবেন। এই একটা উদ্দেশ্যেই মানুষকে লেখা-পড়া শেখাই। বাড়ি ও পাড়ার ছেলেমেয়েরা আমার হাত ছাড়া খায় না, গোসল করে না, ঘুমায় না। এজন্যও অনেক কথা শুনতে হয়েছে। ওরা বলত, ছেলেমেয়েগুলোকে নষ্ট করছে। এদের ওর কাছে যেতে দেন কেন?

দিন যত যায় নির্যাতন তত বাড়ে। নিরুপায় হয়ে একদিন কিতাব থেকে ঠিকানা নিয়ে চট্টগ্রামের মুফতী ফয়জুল্লাহ রহ. এর কাছে নিজের বিস্তারিত বিবরণসহ চিঠি লিখি। আশা ছিল, হুজুর একটা সমাধান দেবেন। চিঠিতে অনুরোধ করেছিলাম ভাইদের কাছে জবাবি পত্র দিতে। হুজুর ভাইদের ডেকে বললেন, আপনাদের বোন ফাতেমার কি সরসপুর বিয়ে হয়েছে?

ভাইয়েরা বলল, জী।

হুজুর তাদের কাছে কিছু না বলে শুধু বললেন, ফাতেমাকে বলবেন সূরায়ে নাহলের শেষ আয়াত এবং সূরায়ে তাহরীমের শেষ আয়াত বেশি বেশি পড়তে। হুজুর কোনো জবাবি পত্র দেননি।

আমি ভাবলাম, হযরত ফাতেমা রাযি. তাঁর পিতার কাছে চাকরানির জন্য আবেদন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাকরানি না দিয়ে তাসবীহ বলে দেন। হুজুরও বুঝি আমাকে এমনই আমল দিলেন। এ ভেবে অনেক কাঁদলাম। মনে মনে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করলাম।

এভাবে দিন যায়। একদিন ভাই আমাকে দেখতে আসলেন। তখন একটি মোটা কাঠ দিয়ে আমাকে পেটাচ্ছিল। ভাই চুপিচুপি বললেন, এখানে বকাঝকা আর মারপিটের শব্দ শুনলাম! কে মারছিল? কাকে মারছিল?

চিন্তায় পড়ে গেলাম। অনেকক্ষণ চুপ থেকে ভাবলাম, আমি তো বিড়ালের চেয়েও খারাপ। বললাম, মনে হয় বিড়ালকে মারছিল। তখন আমার শরীরে ছিল মারের দাগ। ভাই বাড়িতে গিয়ে খুব কাঁদলেন। আব্বাকে বললেন, ফাতেমা আপনার মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে কি তাকে খাওয়াতেন না? তাকে ছেলে মনে করে আপনার কাছে নিয়ে আসুন। এবার আনলে আর কোনোদিন ওই বাড়িতে যেতে দেবেন না। এই বলে বাবা আর ভাই খুব কাঁদলেন।

কিছুদিন পর বাবা এসে বাড়ি নিয়ে গেলেন। বাড়ি এসে বললেন, কী গো মা, সেখানে কি কেউ তোকে বকাঝকা আর মারধর করে? তুই তো

কেবল ভালো বলিস। এই তিন বছরে অনেকের কাছ থেকে অনেক কিছু শুনেছি। তুই শুধু বলিস, সবাই তোকে ভালোবাসে, আদর করে, ওরা অনেক ভালো মানুষ, খোদা জানেন কে সত্য বলছে। তোর ভাইয়েরাও তো দু'বার নিজ চোখে দেখে এসেছে।

আমি বললাম, জী না আব্বাজান, ভাইজানরা কিছুই দেখেনি। আন্দাজে কথা বলছে। এমন সময় কুলসুম ও রুকেয়া দৌড়ে এসে বলল, ভাইয়া বাড়ি এসে সেদিন খুব কেঁদেছিলেন। আব্বার কাছে সব খুলে বলেছে।

আমি বললাম, আব্বাজান, আপনি অন্যদের কথায় কান দেবেন না। বিয়ের তো তিন বছর হলো। দুআ করুন আল্লাহ যেন একটি ছেলে-সন্তান দেন। সবাই তো বলে, ওর কোনো বাচ্চা হবে না।

এক কিতাবে পড়েছি—সন্তান হাফেজ, আলেম ও নেককার হলে হাশরের দিন মা-বাবা বিশেষ মর্যাদা লাভ করবে। মনে মনে ভাবলাম, আল্লাহ পাক এমন একটি সন্তান দান করলে হাশরের মাঠে কামিয়াব হতে পারতাম। খোদা পাক সে মাসেই আমাকে এক ছেলে দান করলেন। ছেলেটা জন্মলাভের সাথে সাথে যেন জুলুম-নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেল। মিথ্যা কথা বলতে বলতে ছেলের বাবার মন নষ্ট করে ফেলে। ছেলের জন্য বিভিন্ন জন শার্ট-প্যান্ট নিয়ে আসে। আমি পরতে দিই না, খুলে ফেলি। এগুলো কেটে টুপি, সেলওয়ার ও জামা বানিয়ে দিই। এজন্য আরও বেশি বকা শুনতে হতো। ওসবের কোনো পরোয়া আমার ছিল না। আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় দুঃখের এ সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। নির্জনে রাতের অন্ধকারে প্রভুর দুয়ারে কাঁদি আর ফরিয়াদ করি। সারাদিন সবার সেবা করতে চেষ্টা করি। আর চুপে চুপে বলি—

اے میرے دلبر میرے جاں ے حبیب

اے میرے نزدیک دوروں کے قریب

হে মোর প্রিয়তম, হে মোর জান প্রাণ

হে মোর অতি নিকটতম, হে দূরতমদের অতি নিকটতম।

پردہ دل میں میرے لی آپ جا

خلق کے در پر مجھے دی آپ جا

মোর হৃদয়ের মণিকোঠায় যে জুড়ে আছ কেবল তুমি / হায় কী নির্দয় সৃষ্টির দ্বারে আমায় দিলে ছেড়ে।

پر ہے آپ کے عشق سے سب تن میرے

خلق کے ہاتھوں میں ہیں دامن میری

তোমার ইশক ও প্রেমে প্রেমময় মোর তনুমন / হায় কী নির্দয় সৃষ্টির হাতে মোর ছেঁড়া আঁচল।

بندگی آپ کے ہیں میری زندگی

دور کر دیں اورں کی بندگی

তোমার বন্দেগীই মোর জিন্দেগী / ঊর্ধ্বে তোলো মোর থেকে লোক দেখানো বন্দেগী।

ہر بھلائی آپ ہمیں دیں اے خدا

ہر برائی سے بچائیں ہم کو آقا دائما

কল্যাণ বারিধারায় সিক্ত করো মোদের হে খোদা / সব অমঙ্গল থেকে রক্ষা করো মোদের সর্বদা।

شغل علمی کتب بینی تادم آخر نصیب

دائما فرمائیں ہم کو حبیب

শেষ নিঃশ্বাস অবধি দাও গভীর জ্ঞানমনষ্কতা ও পাঠমনষ্কতা হে প্রিয়!

رحم کمزوری پہ میرے آپ فرمائیں غنی

میرے بچے کو ذخیرہ آپ فرمائیں میری

হে বে-নিয়াজ রহম করো মোরে

দীনতা-হীনতা ও কমযোরীর 'পরে

সন্তানকে সম্বল করো মোর এই অসহায়ের তরে।

এভাবে আরও কত শত কথা খোদার দরবারে নিবেদন করি। বাপের বাড়ি কি শ্বশুরবাড়ি কারও কাছেই কিছু বলি না। একবার আব্বা আমাকে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। বললেন, তুই এত দিন আমার কছে কিছু বলিসনি। এখন তো আমি সবই জেনে গেছি। এবার আমাদের এলাকার অমুক ছেলে সরসপুরে বিয়ে করেছে। তার শ্বশুর তো অত্যন্ত ভালো মানুষ। তিনি তোর জন্য খুব কেঁদেছেন। আমাকে সব কথা বলেছেন। এখন আর কিছু না বলে আল্লাহর নামে এখানে থেকে যা। আল্লাহ পাক তাঁর রহমতে অবশ্যই ব্যবস্থা করবেন।

আমি ভাবলাম, যদি বাচ্চার শিক্ষার জন্য ত্যাগ স্বীকার করি তাহলে আল্লাহ পাক আমাকে দয়া করবেন। এটুকুই আমার ইহকাল ও পরকালের জন্য যথেষ্ট হবে। এ জীবন তো একদিন শেষ হবেই। কিন্তু সে জীবনের তো অন্ত নেই। সন্তান সুশিক্ষা পেলে আমার কাজে লাগবে। এই ভেবে আমি আবারও বাপ-ভাইয়ের কথা অমান্য করে সন্তান কোলে ওই বাড়ি গেলাম এসব কথা বাচ্চার বাবাকে আজও বলিনি। কারও কাছ থেকে শুনেছেন কি না জানি না।

এভাবে বিয়ের বয়স আট বছর হলো। ইতোমধ্যে আল্লাহ একটি কন্যা সন্তান দান করেছেন। নির্যাতনও দিন দিন বাড়তে লাগল। একদিন সকালে সবাই খেতে বসেছে। একান্নবর্তী সংসার, ঘরের ভেতর সবার বসার জায়গা হয় না। সব ছেলে আমার ছেলেটাকে ধাক্কায়। প্রতিদিনই এমন করে।

বিষয়টি একদিন শ্বশুরের চোখে পড়ল। আমি প্রতিদিনই আমার ছেলেকে দরজার বাইরে গিয়ে খাওয়াই। আজও খাওয়ালাম। অন্যদিনের মতো আজও কাউকে কিছু বললাম না। আজ শ্বশুর খাওয়া শেষে কাউকে কিছু না বলেই শাশুড়িকে নিয়ে ঘরের ধান-চাল ও হাঁড়ি-পাতিল ভাগ করে দিলেন। সবাই যার যার ভাগ নিল কিন্তু আমি আমার ভাগ আনতে পারলাম না। কারণ, ভাগ হচ্ছিল ঘরের বাইরে। এজন্য গাল-মন্দ শুনতে হলো। তবুও আনতে গেলাম না। গালাগালি ও চেঁচামেচি শুনে অন্য বাড়ির এক বুড়ো মহিলা এগুলো এনে দিল। চুপিসারে বলে গেল, এখন থেকে নিজেরটা নিজেই আনতে হবে। এখন আর পালিয়ে থাকলে চলবে না। তোর তো ছেলে-মেয়ে আছে, শ্বশুর-শাশুড়ি ও ননদ আছে। তাদের তো খাওয়াতে হবে। পর্দা করবি চোখে। বাইরে না গিয়ে কি চলতে পারবি! তোর ধান শুকাবে কে? লাকড়ি আনবে কে?

আমি চুপ করে শুনে রইলাম। কিন্তু এখন এমন নিরুপায় হলাম যে, না লাকড়ি আছে না অন্য কোনো কিছু আছে। সংসার ভিন্ন করার সাথে সাথেই যেন সবাই অপরিচিত হয়ে গেল।

এখন দেখা দিল নতুন সমস্যা। ছেলে-মেয়েদের অন্যরা তাদের ঘরে নিয়ে যায়। পর্দার কারণে আমি তাদের আনতে যেতে পারি না। একদিন আমি বাচ্চাদের কেঁদে বললাম, তোমরা কোথাও যাবে না। বাইরে গেলে খাটে আওয়াজ দিলে তোমরা দৌড়ে চলে আসবে। এখন বাচ্চারা আওয়াজ দিলেই দৌড়ে এসে পড়ে। কিন্তু কিছুদিন পর বাচ্চারা শব্দ শুনে আর আসে না। কারণ, ওদের বারণ করা হতো।

এখন কান্না আর দুআই আমার সঙ্গী। সারা রাত জেগে জেগে পুকুর ও ঘরের সব কাজ সেরে নিতাম। বাচ্চারা ঘুমে থাকতেই রান্না সেরে ফজর নামায পড়েই ঘরের দরজা বন্ধ করে বাচ্চাদের ঘরে পড়াতাম।

একদিন সকালে নামাযে দাঁড়ালাম। একটি ছেলে এসে বাচ্চাটাকে ঘুম থেকে ডেকে নিয়ে গেল। গেছে যে গেছে আর খবর নেই। যে নিয়ে গেছে সে ঘরে আছে কিন্তু আমার ছেলের কোনো খবর নেই। আমি কাঁদি আর

বলি, এই ছেলেটা সকালে ওকে ডেকে নিয়ে গেছে। এখন সে কোথায়? খানাও তো খায়নি।

যে মহিলার কাছে আমি একথা বলি সে গিয়ে বলার সাথে সাথে ওই ছেলের বাবা এমন খারাপ গালাগাল দিতে লাগল যা মুখে ও কলমে আনা সম্ভব নয়

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ছেলের জন্যে কাঁদি। সবাই চুপচাপ। কারও কোনো ভাবান্তর নেই। রাত পেরিয়ে সকাল হলো। তবুও কোনো খোঁজ নাই। বেলা দশটার দিকে ছেলেটা কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকল।

কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল, আম্মা, ও আমাকে লক্ষণপুর বাজারে নিয়ে যায়। হাঁটতে হাঁটতে আমার পা ব্যথা করছিল। আমি কাঁদছিলাম। সে 'আর অল্প' 'আর অল্প' করতে করতে থাকে। অনেকক্ষণ পর বলল, এই যে লক্ষণপুর বাজার। কত জিনিস পাওয়া যায় এখানে। আমার সাথে প্রতিদিন আসলে তোকে অনেক কিছু দেখাব। আমাকে বলল, তুই এখানে দাঁড়া আমি টাকা আনি। আমরা খেলা দেখতে যাব। এই বলে সে কোথায় চলে গেছে আর পাইনি। রোদে আমি দাঁড়িয়ে কাঁদি আর ওকে ডাকি। সে আর আসে না। ধীরে ধীরে সব মানুষ চলে যায়। একা আমি অনেক ভয় পেয়ে যাই। এক লোক আমাকে কাঁদতে দেখে কত কথা জিজ্ঞেস করেছে। ভয়ে কথা বলিনি। লোকটি আমাকে একটি দোকানে নিয়ে গেল। সেখানে বসে বসে কাঁদতে থাকি। রাতে দোকান বন্ধ করার সময় দোকানদার বলল, বের হয়ে যা আমি দরজা বন্ধ করে দেব। আমি বের হতে না চাইলে টেনে বের করে দেয়। দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

এক বুড়ো লোক হঠাৎ বলল, তুই কেরে? মাওলানার পুত নিরে? আমি কাঁদতে কাঁদতে মাথা নাড়লাম।

বলল, এখানে আইছস কেন? কে তোরে আনছে?

এই বলে আমার হাত ধরে নিয়ে এল। কাছারির সামনে এসে বলল, এখন চিনবি? আমি মাথা নাড়লাম।

আমি বললাম, আগে কোনোদিন তাকে দেখেছিলে? কোনো দিন কি এ বাড়িতে এসেছিল।

: জী না। কোনোদিন দেখিনি। দেখলেও চিনব না।

আমি বললাম, আমি নামায পড়ার সময় কেউ ডাকলে বলবে, আম্মা সালাম ফিরিয়ে নিক। কেউ আসলে দরজা খুলবে না।

দিনগুলো এত দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে কাটলেও মনে কোরআন-হাদীস শেখা ও বোঝার প্রবল আগ্রহ জেগে ছিল। ব্যস্ততার মাঝেও সারাক্ষণ কিতাব হাতে নিয়ে কাজ করতাম। ছোটবেলা একবার আব্বার মুখে শুনেছি বড় ভাইকে বলছিলেন, 'নাহু-সরফ ভালো না বুঝলে কিছুতেই কোরআন-হাদীস বুঝতে পারবে না।' এ কথা শুনে ভেবেছিলাম, নাহু-সরফের সব কিতাব ও আরবী শব্দার্থ মুখস্থ করলেই কোরআন-হাদীস বুঝে আসবে। এ ভাবনা থেকে কাজের ফাঁকে আর রাত জেগে নাহু-সরফের কিতাব ও অসংখ্য আরবী শব্দ মুখস্থ করতে থাকি। কিন্তু কোরআন-হাদীস কিছুতেই বুঝতে সক্ষম হলাম না। কারণ, এমন কেউ ছিল না যার কাছ থেকে বুঝে নেব। আমি কেবল পড়ি আর দুআ করি—দয়াময় খোদা, আপনি দয়া করে কোরআন-হাদীস বোঝার তাওফীক দান করুন। এত চেষ্টার পরও বুঝি না বলে কান্না আসত। তবুও ধারাবাহিক পড়েই যাই। উর্দু-ফার্সি-বাংলা কিছু কিছু বুঝে উঠছিলাম। আমার প্রবল ধারণা হলো বেশি বেশি পড়লেই মেহেরবান খোদা বুঝিয়ে দেবেন। তাই পড়ার গতি আরও বাড়িয়ে দিলাম।

পড়ার মধ্য দিয়েই বাবার বাড়ি ও শ্বশুর বাড়ির দায়িত্ব পালন করে যাই। এর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন দায়িত্ব ছিল আমার এক অসুস্থ জায়ের সেবা-শুশ্রূষা। আমার বিয়ের সাত মাস পর ওর বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর কী কুদরত টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তার এক হাত ও এক পা অবশ হয়ে যায়। তার তিনটি সন্তান ছিল। আমি অসুস্থ। তবুও তার সন্তানদের সেবা করি। তাদের সেবা করার কেউ ছিল না। তারা অন্য ঘরে থাকত। ওদের সংসার ছিল আলাদা। ওদের ঘরে গিয়ে সেবা করে আসতাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এ অসহায় মানুষগুলোর সেবা করলে খোদা আমাকে

ভালোবাসবেন। এ অসুস্থ জা ৪৩ বছর অসুস্থ অবস্থায় বেঁচে ছিল। এই অসুস্থতার মধ্যেই আরও চারটি সন্তান জন্ম লাভ করে। তার স্বামীও আর বিয়ে করেনি। তাদের কোনো কাজের লোক ছিল না। আমি একাই তাদের কাজ করে দিয়ে আসতাম।

ছোট বেলাও অসুস্থ মা আর ছোট ভাই-বোনের সেবায় দিন কাটিয়েছি, আর শ্বশুর বাড়ি এসে অসুস্থ জা আর ওর সন্তানদের সেবা করে দিন কাটাই। অসুস্থ জায়ের হাত-পা অবশ অবস্থায়ও আরও চারটি সন্তান হয়। দুই ঘরের কাজ করি আর কিতাব-কোরআন মুখস্থ করি। কীভাবে কোরআন মাজিদ বুঝব, নামাযে কোরআন মাজিদ কীভাবে খতম করব এ ভাবনায় আমি ব্যাকুল হয়ে থাকি। কখন দিন শেষ হয় আর কখন রাত শেষ হয় টেরই পেতাম না।

ধীরে ধীরে আমার সন্তানরা বড় হতে থাকে। বড় হতে থাকে দেবরদের সন্তানরাও। ওরা সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়। আমি তাদের সন্তানদের চুপি চুপি ডেকে এনে নামায, কোরআন মাজিদ ও দীনি মাসআলা শিক্ষা দিই। ওরা হায় হায় করে উঠত। এলাকার বাচ্চাদের পড়ানোর কারণে কত যে গালমন্দ শুনতে হয়েছে আর অপমানিত আমাকে হতে হয়েছে! এসবের পরওয়া আমার ছিল না। সব সয়ে নিয়ে ছিলাম এ সংকল্পের দরুন—যত দিন বেঁচে থাকব এই বাড়িতে দীনি মাসআলা-মাসায়েল চর্চা করব। তাদের সন্তানদের দীনি ইলম শেখাব। তাদের সন্তানরা একটু বড় হয়ে উঠলে আমার কাছে আসতে কড়াভাবে নিষেধ করে দেয়। এখন ওরা আর আমার কথা শোনে না, কাছে আসে না। তবুও ওদের চুপি চুপি আদর করে আল্লাহ পাকের দীন শেখাতে থাকি। বহু কষ্টে তাদের কিছু ইলমে দীন শেখাতে সক্ষম হই।

আমার সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষা দিতে গিয়ে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। কারণ, এলাকায় কোনো মক্তব বা মাদরাসা ছিল না, বাড়ির পরিবেশও ছিল অন্য ধরনের, যা পূর্বে লিখে এসেছি। আমাদের বাড়িতেও কোনো চাচি, জেঠা, খালা, ফুফু, দাদি, নানি, মামি কেউ ছিল না। এক বৃদ্ধ

বাবা ছাড়া আমার আর কেউই ছিল না। বাপের বাড়ি গেলে ছোট ভাই-বোন ও সৎ মাকে কোরআন মাজীদ ও ধর্মীয় কিতাবাদি পড়াতাম। শ্বশুরের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে বাবা দুই/তিন মাসের জন্য বাড়ি নিয়ে যেতেন। এভাবে চার/পাঁচ বছর তাদের পড়াই। এরপর ছোট বোনদের বিয়ে হয়ে যায়।

নিজ সন্তানদের অধিকাংশকে কোরআন মাজীদের সাথে সাথে উর্দু-ফার্সি ও প্রাথমিক বাংলা ঘরেই পড়িয়েছি। এরপর তাদের বাবার সাথে মাদরাসায় পাঠাই। এলাকায় ভালো পরিবেশ না থাকায় তাদের পড়ানো সহজ ছিল না। মাঝে মাঝেই তাদের কেউ কেউ অন্য বাড়ির শিশুদের সাথে খেলতে চলে যেত। পর্দার কারণে তাদের ফিরিয়ে আনতে কষ্ট হতো। তবে তারা প্রায় সকলেই প্রাথমিক পড়া-শোনা দ্রুত শেষ করে। বয়স আট হলে মাদরাসায় পাঠিয়ে দিতাম। বাকিদের এভাবে পড়াতে থাকি আর এক এক করে মাদরাসায় পাঠাই। কিন্তু মাদরাসায় পাঠালেই কি আর দুশ্চিন্তা শেষ হয়? বাচ্চারা বাড়ি এলে দুষ্ট ছেলেরা তাদের ডেকে নিয়ে যায়। সময়মতো খায় না। আমি জায়নামাযে পড়ে কাঁদতাম আর ব্যাকুল হয়ে প্রভুর দরবারে ফরিয়াদ করতাম—

عالم وصالح وزاہد ومتقی وپارسا حسن وجمال

خوبصورت نیک سیرت پاک طینت بے زوال

আলেম, সালেহ, যাহেদ, মুত্তাকী বানান তাদের / যাহের বাতেনের অক্ষয় ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য এবং উন্নত স্বভাব-চরিত্রের শোভায় সুশোভিত করুন তাদের।

آپ ہی انہیں بنا لیں اپنے رحمت سے معین

کردے سینے کو کشادہ آپ انکی بہر دیں

আপন কৃপায় গোনাহের আবিলতা থেকে চিরঅবমুক্ত রাখুন তাদের / দীনের তরে বক্ষ উন্মুক্ত করে দিন তাদের।

شغل علمی شوق علمی دیں انہیں

کل قسم کی کل بھلائی دیں انہیں

গভীর ইলমী মগ্নতা ও জ্ঞানপিপাসায় ধন্য করুন তাদের / সর্বপ্রকার কল্যাণ-ধনে ধনী করুন তাদের।

আরও কত শত মুনাজাত আর কান্না। ছেলে-মেয়েদের পড়া শেষ হওয়ার আগেই দয়াময় খোদা দুটি যমজ নাতি দেন। এবার এদের লালন-পালন ও শিক্ষাদানে আমি নিমগ্ন হই। এরাও বাইরে গেলে আনতে পারি না। যার কারণে এদের শরীরে কাটার দাগ রয়েছে। বাইরে গেলে অন্য ছেলেরা মারধর করত। ওরা কাঁদতে কাঁদতে ঘরে আসত। আমি তো কিছুই বলতে পারতাম না। কেবল অশ্রু দিয়ে বুক ভাসাই আর বলি—

رَبَّنَآ اَخۡرِجۡنَا مِنۡ هٰذِهِ الۡقَرۡيَةِ الظَّالِمِ اَهۡلُهَا ۚ وَاجۡعَلۡ لَّنَا مِنۡ لَّدُنۡكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجۡعَلۡ لَّنَا مِنۡ لَّدُنۡكَ نَصِيۡرًا

হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের এ জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান করো। এখানকার অধীবাসীরা যে অত্যাচারী। তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও। –সূরা নিসা (০৪) : ৭৫

আমি এভাবে কাঁদি আর খোদা পাকের দরবারে মুনাজাত করি—হে প্রভু, আপনি দয়া করে মাদরাসার কাছে একটি বাড়ি মিলিয়ে দিন। আপনার নেক বান্দাদের সঙ্গে সর্বদা জীবনযাপনের সুযোগ করে দিন। আরও কত শত দুআ আর কান্না। কিন্তু কোনো উপায়ই আমি খুঁজে পাই না। কোনো ব্যবস্থাও হয় না।

একসময় স্বামীর অনুমতি নিয়ে বিবাহিত দুই ছেলের পরিবারকে ঢাকায় তাদের মাদরাসার কাছে পাঠিয়ে দিই। তারা ওখানে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করে। আমি তাদের ওখানে গেলেও থাকতে পারি না। অসুস্থতা বেড়ে যায়। বাধ্য হয়ে গ্রামে ফিরে আসি। কারও বারণ শুনি না। গ্রামে এসে আবার বাড়ি ও পাড়ার মেয়ে ও বয়স্কদের শিক্ষাদানে লেগে যাই। ডায়বেটিসসহ বার্ধক্যজনিত অসুস্থতাগুলো বেঁকে বসেছে। তবুও আল্লাহর নামে কোরআন-কিতাব পড়িয়ে যাচ্ছি।

আগেই বলেছি নিজের মধ্যে নাহু-সরফ বোঝার ব্যাকুলতা ছিল। সে জন্য সন্তানদের কেউ মাদরাসা থেকে বাড়ি এলে তাকে একটু শোনাই আর ভুলগুলো শুধরে নিই। বয়স দশ-এগারো হলেই তারা আর পড়া শুনতে চায় না। রাগ করে বলে, বাড়িতে আসলেই পড়া শুনতে বলে। আমাদের পড়া শুনাতে হবে কেন? একজন আরেকজনকে বলে, পড়া শুনালে কাঁদতে হয় নাকি? কেউ কি কিছু বলেছে! শুধু শুধু কাঁদে! এ জন্যই ভালো লাগে না। আরেকজন বলত, আমরা আর শুনতে পারব না। এভাবে বাচ্চাদের যত্ন করে করে শুনাই আর কাঁদি। আমি ব্যাকুল হয়ে কাঁদি কোরআন-হাদীস বোঝার জন্য।

একদিন এক ছেলেকে নাহবেমীর কিতাব অর্থসহ মুখস্থ শুনাচ্ছিলাম আর এই দুঃখে দুই গাল বেয়ে অশ্রু ঝরছিল, এত কষ্ট করে পড়ি তবুও কেন কোরআন পড়ার সময় সব অর্থ বুঝি না। এসব কষ্ট তো শুধু আল্লাহ পাকের জন্যই করছি। তবুও কেন বুঝে উঠতে পারছি না। কিন্তু সন্তানরা তো আর কারণ জানে না। তাই ওরা বিব্রত বোধ করে।

আমি কাতরস্বরে বলি, একটু শোনো। এগুলো পড়লে তো কোরআন-হাদীস বুঝতে পারব।

যদিও কোরআন মাজীদের সাথে সাথে উর্দু তরজমা ও *বয়ানুল কোরআনের* তাফসীর আমার প্রায় মুখস্থ ছিল তবুও সরাসরি আরবী থেকে বোঝার আগ্রহ ছিল প্রবল। একসময় আল্লাহ মনের আশা পূরণ করেন। আরবী থেকে বোঝার তাওফীক দেন।

এর মধ্যে সন্তানদের কয়েকজন ঢাকায় পড়তে চলে যায়, দুজন পাকিস্তানে। আমি দুঃখিনী একা একাই পড়ি। কোরআন মাজীদ শোনানোর জন্য আল্লাহ পাক তাঁর রহমতে ব্যবস্থা করে দেন। প্রথম তো সন্তানদের শোনাতে থাকি। পরে আবার বিভিন্ন মাদরাসার হাফেজা মেয়েদের অন্তত বিশ ত্রিশ খতম শোনাতে সক্ষম হই। যাতে মেহেরবান খোদা নামাযে খতম করার তাওফীক দান করেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।

এহেন অবর্ণনীয় দুঃখের ভেতর যে আমি দীর্ঘ ৭৪ বছর কাটালাম। কোনো দিন এ কথা ভাবিনি, আমার এত দুঃখ কেন? আমার শ্বশুরবাড়ি, ভাই-বোন, ঘরের লোকজন, স্বামী, সন্তান আমাকে কেন দেখতে পারে না? অমুকে এমন, অমুকে এত সুখ করে, অমুকের স্বামী এমন। আমি সর্বদা নিজের পাপের জন্য লজ্জিত, ভীত ও কম্পিত। যতই বকা-ঝকা আর মার খেয়েছি ততই কেঁদেছি আর চুপি চুপি বলেছি, হে আল্লাহ, আপনিই তো আমাকে বানিয়েছেন। আমাকে দয়া করে ভালো করে দিন। উত্তম চরিত্র দান করুন। আমাকে আপনার প্রিয় ও আপন বানিয়ে নিন।